অমৃতকথা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা ও ছবি

অমৃতকথা

চিত্র : শ্রীকমলকুমার মজুমদার
সংযোজনা : দয়াময়ী মজুমদার

সান্যাল প্রকাশন ॥ কলিকাতা-৯

প্রকাশক : গৌরাঙ্গ সান্যাল। সান্যাল প্রকাশন
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা-৯
প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৯৬০।
মুদ্রক : জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন। কলিকাতা-৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদা গীতায় একথাই বলেছিলেন
যে ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ… !
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর
তিনিও জানিয়েছিলেন যে আত্মমর্যাদার জ্ঞান
থেকেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ।
এরপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে বললেন
"যার মান আছে আর হুঁস আছে সেই মানুষ !
অর্থাৎ মনুষ্যত্বের বোধ আছে তারই…কি সহজ
সরল সমাধান…কি প্রাণবন্ত কথাটি !
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর প্রতিটি কথা
বাস্তব-উপলব্ধির নিরিখে মেপে মেপে যেন
উচ্চারণ করেছিলেন এবং সেই পরম উপলব্ধির
বাণীগুলি এক একটি যেন চিত্রিত আলেখ্য যা
মনকে স্পর্শ করেই থাকে।
শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে ছবি

আঁকবার প্রয়াস করেছিলেন আমার স্বামী কমল কুমার মজুমদার তবে তাঁর জীবিতকালে সে প্রয়াস সফল হয়নি। তাই তাঁর প্রয়াণের পর তাঁরই আঁকা কিছু ছবি-সঙ্কলিত উক্তিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে এই বইটি প্রকাশিত হল ॥

দয়াময়ী মজুমদার

অমৃতকথা



১

বালক যেমন তার স্বভাবের বশেই
টাকাকড়ি ফেলে পুতুল নেয়। তেমনই
বিশ্বাসী ভক্ত ঈশ্বর ছাড়া কিছুই চায় না
কিন্তু সংসারের ধনমান ফেলে
আর কেউই তাঁকে চায় না!



২

পবিত্রহৃদয় বালক ও যুবকদের
ধর্মপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত
কেন না তাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি
ঢোকেনি, একবার বিষয়বুদ্ধি
ঢুকলে বা মায়া রাক্ষুসী কামড়ালে
আর সে পথে নিয়ে যাওয়া
ভার— ।



৩

যেমন ঝিক্‌নে কাটি নিয়ে মাঝে মাঝে
উনুন নেড়ে দিতে হয় তাতে নিভু নিভু আগুন
আবার সতেজ হয়ে ওঠে, সেইরকম সাধুসঙ্গ
করে মনকেও সতেজ রাখতে হয়। ডাক্তার
দেখলে রোগের কথা, উকিল দেখলে মকদ্দমার
কথা আর ভক্ত দেখলে ভগবানের কথাই
মনে পড়ে— !



৪

ওরে ধোপা ভাঁড়ারী হসনে ।
লোকের ময়লা কাপড় নিয়েই
ধোপার ভাঁড়ার, পরিষ্কার
হলেই তার ভাঁড়ার খালি হয়ে
যায় । তাই বলি তোরা ধোপা
ভাঁড়ারী হসনে !



৫

বাঘের ভেতরেও ঈশ্বর আছেন সত্য
কিন্তু বাঘের সামনে যাওয়া উচিত
নয়। কুলোকের মধ্যেও ভগবানই
আছেন বটে কিন্তু তবু কুলোকের
সঙ্গ করা উচিত নয়— !



৬

যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে যদি
তারই মধ্যে ভূত ঢোকে, ভূত ছাড়াবে
কেমন ক'রে— ? যে মন দিয়ে
সাধনা করবে তাই যদি বিষয়াসক্ত
হয়ে পড়ে সাধনা কি করে হবে ?



৭

ছেলে হল না বলে লোকে দুঘটি
কাঁদে, বিষয় হল না বলে হা-হুতাশ
করে কিন্তু ঈশ্বরকে দেখবার জন্য
ক'জন ব্যাকুল হয়—, যে চায় সে
কিন্তু পায়.... !



৮

বদ্ধ জীব যারা, তারা কত শোক-তাপ,
দুঃখ-যাতনা পায় । তবু কিছুদিন
পরে যে কে সেই । স্ত্রী মরে
গেল আবার বিয়ে করলে, ছেলে
মরে গেল, কত শোক পেল কিন্তু
কিছুদিন পরে আবার সব ভুলে গেল
এই হল বদ্ধ জীব··· ।



৯

…অর্থ যার দাস সেই মানুষ !
আর যারা অর্থের দাসত্ব করে—
তারা অর্থের ব্যবহার মানে না
তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয় ।
মানুষের আকার মাত্র, তাদের
ব্যবহার কিন্তু পশুর মতন— !



১০

পথে যেতে যেতে রাত্রি হয়ে
পড়ায় এক মেছুনী এক
মালীর বাড়ীতে আশ্রয় নেয় কিন্তু
বাগানের সুন্দর ফুলের গন্ধে
রাত্তিরে তার ঘুম এল না। তখন সে
তার আঁশ চুবড়ীতে জল ছিটিয়ে নাকের
কাছে রেখে ঘুমলো। বিষয়ী অন্ধ
জীবেদেরও সংসারের পচা গন্ধ ছাড়া
আর কিছুই ভাল লাগে না…।



১১

কাক ভারী বুদ্ধিমান, তার উড়ুং আছে, পুড়ুং আছে, চুড়ুং আছে, তাই কিন্তু বিষ্ঠা খেয়ে মরেন অতি বুদ্ধির বা পাটোয়ারী বুদ্ধিরও ঐ দশা।



১২

মনে কুপ্রবৃত্তির বাস মানে
নোংরা জায়গায় বাস অর্থাৎ
নরক বাস.... !



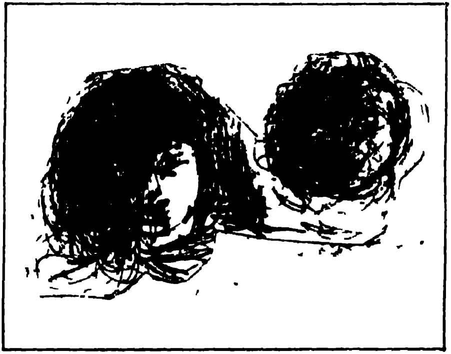
১৩

ভাবের ঘরে চুরি থাকলে—
কিছুই হবে না… ।



১৪

এক শিষ্য ‘গুরু গুরু’ বলে নদী পার
হয়ে গেল। গুরু দেখলেন এবং মনে মনে
ভাবলেন—‘আমার নামের এত জোর
আমি ত’ আগে জানিনি।’ পরদিন
গুরু—“আমি, আমি করতে করতে
নদী পার হতে গিয়ে দু-চারবার বলতে না বলতে
একবারে অগাধ জলে পড়ে গেল
আর সামলাতে পারলে না, প্রাণ
গেল....।



১৫

দুই বন্ধু একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে
একজন ভাগবত পাঠ শুনতে গেল,
আব একজন বেশ্যালয়ে আমোদ
করতে গেল। যে ভাগবত পাঠ
শুনছিল সে ভাবল—'হায়, আমি
কেন বন্ধুর সঙ্গে গেলুম না, বন্ধু
কতই না আমোদ করছে। আর যে
ছিল আমোদের জায়গাতেই
সে ভাবল—'হায় আমি
কেন এখানে এলুম।' ফল হল কি
যে ভাগবত পাঠ শুনছিল তার বেশ্যালয়ে
যাবার ফল হয়—আর যে সেখানেই
ছিল তার ভাগবত পাঠ শোনার ফল হল।



১৬

দেখ, তোমাদের নির্লিপ্ত সংসারী কেমন জান— ? একটি গরীব লোক এক বাড়ীতে ভিক্ষা করতে গেছে—তা বাড়ীর কর্তাটি নির্লিপ্ত সংসারী সেজে বসে আছেন। টাকা কড়ি সবই তিনি স্ত্রীর হাতে দেন। কর্তাটি বললেন—'টাকা আমি ছুঁই না।' কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা। তখন কর্তাটি ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে সব বললেন। স্ত্রী ত' জ্বলে উঠল—'টাকা কি শাকপাতা ? বাবুজী একটি টাকা চাইলেন শেষে স্ত্রী একটি দুআনি দিয়ে বলল—'তবে এই নে যাও।' নির্লিপ্ত বাবুজী অগত্যা তাই এনে দিলেন। বুঝলে— ?



১৭

মায়াকে চিনতে পারলে মায়া সে
আপনি পালায়। চোর বাড়ী
এসেছে, গেরস্থ টের পেলে চোর যেমন
আপনি পালায়।



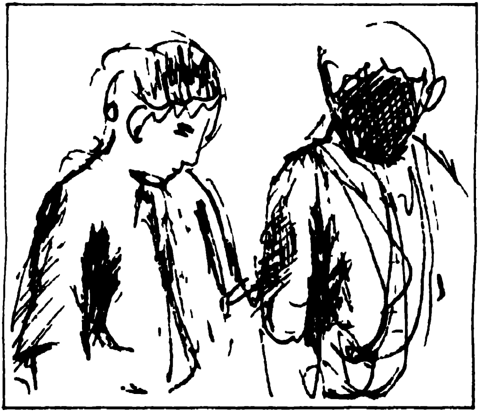
১৮

অসতী স্ত্রীলোক যেমন বাপ, মা ও
সমস্ত পরিবারের ভেতর থেকে থেকে
সংসারের কাজকর্ম করে কিন্তু তার
মন পড়ে থাকে সেই উপপতির দিকে ।
হে সংসারী জীব ! মন ঈশ্বরে রেখে
তুমিও বাপ মা এবং পরিবারের
কাজ করো— ।



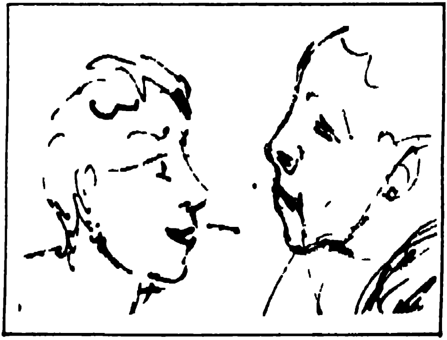
১৯

মানুষ দু রকম—
মানুষ আর মানহুস,
যার হুঁস আছে সেই
যথার্থ মানুষ··· !



২০

জ্ঞান—পুরুষ। ভক্তি—
স্ত্রীলোক। ঈশ্বরের—
বাইরের বাড়ীতে জ্ঞান
যেতে পারে কিন্তু
অন্তঃপুরে ভক্তিছাড়া আর
কেউ ঢুকতে পারে না।



২১

একজন সস্ত্রীক বিরাগী—
নানা তীর্থে ভ্রমণ করে।
একদিন স্বামীটি—পথে
কয়েকটি হীরে পড়ে থাকতে
দেখে ভাবল—'যদি আমার
স্ত্রীর মনে লোভ জন্মায়— ।'
তাই ভেবে সে হীরের ওপর মাটি
চাপা দিলে। স্বামীর কাণ্ড দেখে
তার স্ত্রী এগিয়ে এসে পা দিয়ে
মাটি সরিয়ে দিয়ে বল্লে—এখনো
হীরে, মাটি তফাৎ,
তবে বনে এলে কেন— ?



২২

শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি একই। সন্তান
যেমন পয়সার জন্যে মার কাছে
আব্দার করে। কখনও কাঁদে কখনও মারে—
সেইরকম ঈশ্বরকে আপনার হ'তে আপনার
জেনেও, তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল
অন্তরে কাঁদে। তাকে ভগবান দেখা না দিয়ে
থাকতে পারে না!



২৩

মন যোগীর বশ,—মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয় ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়—কুম্ভক হয়। যেমন একজন ঝাঁট দিচ্ছিল, সে সময়ে এবার একজন লোক এসে বল্লে—“ওগো অমুক নেই! মারা গেল। যদি আপনার লোক না হয় এখন সে ঝাঁটা দিতে দিতে বলে—‘আহা তাইত গা লোকটা মারা গেল!’ এদিকে ঝাঁটাও চলছে। কিন্তু আপনার লোক হলে হাত থেকে ঝাঁটা পড়ে যায়—আর ‘এ্যাঁ’ বলে বসে পড়ে। তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে আর কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারে না।



২৪

যেমন স্ত্রীলোকেরা একহাতে ঢেঁকিতে চিঁড়ে
কোটে, অন্য হাতে হয়ত ছেলেকে বুকে
নিয়ে দুধ দেয় আবার মুখে খদ্দেরদের
সঙ্গে চিঁড়ের দাম করে। কিন্তু
তার মন পড়ে থাকে ঢেঁকিতে তেমনি
সংসারে থেকে সকল কাজ কর
দৃষ্টি রেখো কিন্তু যেন তাঁর পথ থেকে
দূরে না চলে যাও।



২৫

জাহাজ যেমন আপনি চলে ও
বড় বড় গাধা বোটকে সঙ্গে নিয়ে
যায়—তেমনই জানবে মহাপুরুষ যখন আসেন
তিনি বদ্ধ লোকদের টেনে নিয়ে যান।

জমা খরচের জ্ঞান থাকা চাই

২৬

একদিন এক নাপিত রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পেলে কে যেন তাকে ডেকে বলছে—“এই সাত ঘড়া মোহর নিবি… ?” কথাটা শুনে নাপিতের কেমন লোভ হল সে তখন চারিদিকে দেখতে লাগল কিন্তু কারুকে সে দেখতে পেলে না তখন খানিক এগিয়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে বললে—‘নোবো’… । তারপর সে শুনতে পেলে কে যেন বলে উঠলো—‘যা… নিগে যা তোর বাড়ীতে রেখে এলুম— ।’

নাপিত তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে দেখে যে সত্যিই সাতটা ঘড়া বসানো রয়েছে। আনন্দে সে ঘড়াগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। সে দেখ্‌লে যে ছটি ঘড়া মোহর ভর্ত্তি আর একটি খালি। সে তখন খালি ঘড়াটি ভর্ত্তি করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার বাড়ীতে যা সোনা, রূপো ছিল সবই এনে ঘড়ায় পুরলে কিন্তু তাতে

সে ঘড়া ভর্ত্তি হবে কেন ? তখন সে তার সংসারের খরচ কমিয়ে ঘড়ায় টাকা পুরতে লাগলো ফলে তার সংসারের দুঃখ কষ্ট আরো বেড়ে গেল। তখন বুদ্ধি করে রাজামশায়ের কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করে বলত লাগলো যে তার মাইনে বাড়িয়ে না দিলে সংসার আর চলছে না। তার কথা শুনে রাজা তার মাইনে ডবল করে দিলেন। কিন্তু সেই টাকা এনে সে ঘড়ায় পুরতে লাগলো তাই নাপিতের দুঃখ আর ঘুচলো না,সেই একই দশা রইল। তার দুরবস্থা দেখে রাজা একদিন তাকে ডেকে বললেন—'হ্যাঁরে তোর একি হাল এখন ? ডবল মাইনে পাচ্ছিস তবে তোর এ হাল কেন ? আগে কম মাইনে পেয়ে তোর এ হাল ছিল না। তবে কি তুই সেই সাত ঘড়া মোহর এনেছিস নাকি ?

রাজার কথা শুনে নাপিত ভয়ে ভয়ে বল্লে—"হুজুর আপনি কি করে জানলেন ?" রাজা বললেন—" সেই যখটা আমার কাছে এসে বলেছিল—সাত ঘড়া মোহর নেবে ?" আমি জিগ্যেস করেছিলুম—"ওটা জমার জন্যে না খরচের জন্যে ?'

আমার কথায় যখটা পালিয়ে গেল । আরে যখের ধন কেউ খরচ করতে পারে না কেবলি আগলে রাখে । ভাল চাসত শিল্পীর ফিরিয়ে দিয়ে আয় আর তা না হলে তোব সর্বস্ব খুইয়ে তোকে যখের ধন আগলে রাখতে হবে ।"

রাজার কথা শুনে নাপিত তাড়াতাড়ি ছুটলো সেই জায়গায়—যেখানে যখের সঙ্গে সে প্রথমে কথা বলেছিল । সেখানে গিয়ে সে বলতে লাগল—"তোমার টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও আমার আর দরকার নেই ·· !'

যখটা উত্তর দিলে—"আচ্ছা ।"

নাপিত বাড়ী ফিরে এসে দেখলে যে সাতটা ঘড়াই নিয়ে গেছে । নাপিতের ত মাথায় হাত ! মনে মনে তার ভারী দুঃখ হল যে এতদিন ধরে সে কত কষ্ট করে খালি ঘড়াটা ভরে ছিল যখটা সেটাও নিয়ে চলে গেল ! তার সর্বস্ব খোয়া গেল ।

ঠিক তেমনই মানুষের কোনটা সৎ আর কোনটা অসৎ এই বিচারবোধ না থাকলে জীবনের সব পুঁজিই শূন্য হয়ে যাবে তাই কোনটা জমার আর কোনটা খরচের এই জ্ঞানটা থাকা চাই কেন না ধর্মপথের এই জ্ঞানটাই প্রথম দরকার ।

বিষয় কূপে থাকতে থাকতে ধর্মাধর্ম জ্ঞানটুকুও থাকে না— !

২৭

কোন এক গুরুর—কাপড়ের দোকানী এক শিষ্য ছিল। একদিন সেই গুরুর পুঁথি বাঁধানোর জন্যে এক টুক্‌রো কাপড়ের দরকার ছিল তিনি সেই শিষ্যের দোকানে এসে একটু টুকরো কাপড় দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। প্রথমে শিষ্যটি নানা ওজর আপত্তি করে জানাল যে তার যা টুকরো কাপড় ছিল সে একে তাকে দিয়ে দিয়েছে। এখন তার কাছে আর নেই। শেষে বল্‌লে—'আপনি মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিয়ে যাবেন,এবারে টুকরো কাপড় বাঁচলে আপনার জন্যে রাখবো— ।"

শিষ্যের কথা শুনে গুরু চলে যাচ্ছিলেন। দোকানীর স্ত্রী বাড়ীর ভেতর থেকে গুরু-শিষ্যের সব কথা শুনেছিল। গুরুকে চলে যেতে দেখে সে লোক দিয়ে তাঁকে বাড়ীর ভেতরে ডেকে

 পাঠালে। গুরু বাড়ীর ভেতরে এলেন। শিষ্যের

স্ত্রী তখন জানতে চাইলে—"আপনি শিষ্যের কাছে কি চাইছিলেন ?"

গুরু জানালেন যে তিনি পুঁথি বাঁধানোর জন্যে শিষ্যের কাছে একটু টুকরো কাপড় চাইছিলেন। গুরুর কথা শুনে শিষ্যের স্ত্রীটি বললে—"আপনি এখন বাড়ী চলে যান, কাল সকালে আপনাকে ভাল দু টুকরো ছিট পাঠাবো। আর আপনাকে আসতে হবে না।"

গুরু বাড়ী চলে গেলেন। তারপর দোকানদার-শিষ্য যখন বাড়ী ফিরল তখন তার স্ত্রী বললে—"তুমি কি দোকান বন্ধ করে চলে এসেছ নাকি— ?"

স্বামী বললে—"হ্যাঁ, কেন— ?"

স্ত্রী বললে—"তুমি এখন দোকানে গিয়ে দুখানা ভাল ছিট আনো।"

স্বামী বললে—"কাল আমি তোমাকে দুখানা ভাল ছিট্ দোবো, এ আর এমন কি কথা। তবে আজ দোকান বন্ধ করে চলে এসেছি কাল হবে।"

স্ত্রী বললে—"না, এখুনি দিতে হবে আমাকে।"

স্বামী বললে—"কাল আমি তোমাকে নিশ্চয়ই দোবো প্রতিজ্ঞা করছি।"

স্ত্রী বলে উঠল—না, এখুনি। আমায় এখুনি এনে দিতে হবে।"

আর কি হবে তখুনি ফের দোকান খুলে দোকানের ভেতর ঢুকতে হল। এ তো আর গুরু নয় যে বলা যাবে মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবেন—এ যে গুরুর গুরু মহাগুরু! অগত্যা দুখানা ভাল ছিট এনে সেই রাতে স্ত্রীর হাতে দিতে হল। স্ত্রীটি সেই ছিট্ দুখানা সকালে গুরুকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠালে—"আপনার যা দরকার হবে আমাকে বলে পাঠাবেন।"

[অর্থাৎ বিষয় কূপে ডুবে থাকতে থাকতে মানুষের ধর্মাধর্ম জ্ঞানটুকু পর্যন্ত লোপ পায়।]

ঘণ্টাকর্ণ

২৮

একজন প্রচণ্ড শিব-ভক্ত ছিল। তার ভক্তিতে ভগবান দেবাদিদেব তাকে দেখা দিয়ে বললেন—'দেখ বৎস, তোমার সাধনায় তুমি আমায় দেখতে পেলে বটে তবে যতদিন না তুমি কমলাপতি হরির প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করছ ততদিন আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হতে পারবো না।"

শৈব তাঁর কথা শুনে ঘাড় হেঁট করে রইল তারপর দেবাদিদেবও স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

শৈব আবার সাধনা আরম্ভ করল—ভগবান হর (দেবাদিদেব) তার সাধনায় অস্থির হয়ে উঠলেন এবং আবার তাঁকে এসে দেখা দিতে হল। কিন্তু দেবাদিদেব এবারে অর্দ্ধ হর ও অর্দ্ধ হরি (নারায়ণ) রূপে দেখা দিলেন। শৈব কিন্তু অর্দ্ধ হরের মূর্ত্তি দেখে যেমন আনন্দিত হল তেম্‌নি অর্দ্ধ হরির মূর্ত্তি দেখে তার নিরানন্দ হল। সে নিজের ইষ্ট হরের চরণ ধুয়ে পুজো আরম্ভ করল কিন্তু হরির মূর্ত্তির চরণ ধোওয়ান দূরে থাক

একবার সেদিকে চাইলে না পর্যন্ত। তখন ভগবান হর শৈবকে বললেন—'দেখ তুমি যা মনস্কামনা করেছ তা পূর্ণ হবে তবে আমি তোমার মঙ্গলের জন্যে তোমাকে আমার হরি-হর অভিন্ন মূর্ত্তি দেখালুম, তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম যে হরি-হর আলাদা নয় কিন্তু তুমি গ্রাহ্য করলে না বরং হরির প্রতি বিদ্বেষ পুষে রাখলে।এর ফলে তুমি জেনে রাখো যে তোমাকে কষ্ট পেতে হবে… !"

হরের কথা শুনে শৈব অন্যগ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে গ্রামের সকলেই তার হরি বিদ্বেষের কথা জানতে পারল এবং গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা তাকে দেখলেই 'হরি, হরি' বলে হাততালি দিতে আরম্ভ করল। শেষে শৈব নিরুপায় হয়ে নিজের কানে দুটো ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখত যাতে ছেলেরা হরি হরি বোলে চেঁচালে সে সজোরে ঘণ্টা দুটো বাজাত যাতে তার কানে হরিনামের শব্দ না ঢোকে। সেই শৈবকে তাই সকলে ঘণ্টাকর্ণ বলত।

নিজের ইষ্টের প্রতি যেমন গভীর নিষ্ঠা রাখবে তেমনি অন্যান্য মূর্ত্তিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করবে। কখনও বিদ্বেষ পোষণ করো না।

নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপান ভাল নয়

২৯

এক ব্রাহ্মণ রাতদিন খেটে সুন্দর একটি বাগান তৈরী করেছিল। সকলেই তার বাগানের খুব প্রশংসা করত। একদিন একটা গরু হঠাৎ তার বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং বাগানের একটা ভাল গাছ সে খেয়ে ফেলে।তাই না দেখে বাগানের মালিক সেই বামুন রাগে অন্ধ হয়ে সেই গরুটাকে বেদম পিটলে,ফলে গরুটা মারা গেল। তখন বামুনের ভয়ানক ভয় হল যে এইবার গোহত্যার পাপ তাকে ধরবে। তাই মনে মনে সে নিজের দোষ কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। তার প্রতিবেশীরা সকলেই তাকে গোহত্যার জন্য দোষী করতে লাগল। বামুন কিন্তু বলতে লাগল—'এতে আমার দোষ কি ? মেরেছে আমার হাত, হাতের দেবতা যখন ইন্দ্র, এ দোষ ইন্দ্রেরই, আমার নয়··· ।"
গোহত্যার পাপটা তখন বামুনকে ধরতে

এসেছিল কিন্তু বামুনের কথা শুনে সে বোঁ করে ওপরে উঠে গিয়ে ইন্দ্রকে ধরতে গেল। ইন্দ্র, ঘটনাটা শুনে ভাবলেন—'ভ্যালা আপদ, কার দোষ কার ঘাড়ে··· !"

গোহত্যার পাপকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ইন্দ্র তখন ছদ্মবেশে বামুনের সঙ্গে দেখা করতে মর্ত্তে এলেন। তিনিও এক বামুনের বেশ ধরে বাগানের মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ বাগান কার··· ?"

বামুন বললে—'এ বাগান আমারই'।

ইন্দ্র তখন মহাখুশী হয়ে বাগানের খুব প্রশংসা করতে লাগলেন— "বাগানটি চমৎকার, অতি সুন্দর আর আপনার মালিটিও খুবই ভাল তাই বাগানটি এত ভাল হয়েছে··· ।"

বামুন আত্মপ্রশংসা করে বললে—"এ সবই আমার করা।'

ইন্দ্র বললেন—'বাগানের পথটিও কি সুন্দর সাজানো, কে করেছে— ?"

বামুন আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললে—'আজ্ঞে এ সবই আমার হাতে করা··· !'

তারপর ইন্দ্র বললেন—'ঐ যে বাগানের পাশে গরু মরে পড়ে আছে—ওটাকে কি আপনিই

মেরেছেন— ?"
বামুন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—"না, না,ওকে আমি মারিনি ইন্দ্র মেরেছে।"
বামুনের কথা শুনে ব্রাহ্মণ বললেন—"ইন্দ্র কেন মারলে— ?"
বামুন ব্যস্ত হয়ে বললে—'হাতের দেবতা ইন্দ্র এ কাজ তার, এ পাপ আমার নয় এ পাপ ইন্দ্রর।"
তখন ইন্দ্র বললেন—"বাগান করার সময় হাত দুখানা আপনার আর গরু মারবার বেলায় হাত দুখানা ইন্দ্রের···বাঃ বাঃ চমৎকার বুদ্ধি··· !"
এতক্ষণ গোহত্যার পাপটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সব কথা শুনছিল এবার সে এগিয়ে এসে ঝপ করে বামুনের ঘাড়ে এসে চাপল।
[অর্থাৎ মানুষ অন্যায় অপরাধ করে নিজের দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে না দিয়ে, যদি সরল অন্তঃকরণে (নিজের) দোষ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে ভগবানের কাছে কাঁদে তাহলে ভগবান তাকে কৃপা করেনই ॥]

কেউ কারো নয়

৩০

একদিন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের দেখা তাঁদের মধ্যে ধর্ম এবং সংসার সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হওয়ার পর সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণটিকে বললেন—"এ সংসারে কেউ কারো নয় এইটি মনে রেখ বাবা।"

ব্রাহ্মণ একথা বিশ্বাস করতে কিছুতেই রাজী নয় কারণ সে যে স্ত্রী পুত্র, বাপ মায়ের জন্য সব সময়ে খেটে মরছে তারা কেউ নয় একথা সে কি করে ভাবতে পারে। ব্রাহ্মণ বললে—"ঠাকুর, আমার সামান্য মাথা ধরলে যে মা অস্থির হয়ে ওঠে, আমাকে সুখে রাখার জন্যে যারা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে তারা কি আমার কেউই নয়— ?"

সন্ন্যাসী বললেন—"যদি এমন দেখ তাহলে তারা তোমার আপনার বটে। তবে আমার মনে হয় তুমি ভুল বুঝেছ বাবা—, মা, স্ত্রী, পুত্র কেউই তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পারে একথা

বিশ্বাস কোর না তুমি, সত্যি কিনা একবার পরীক্ষা করে দেখ। আজ বাড়ী গিয়ে রোগের ভান করে বিছানায় শুয়ে থাক আর রোগের যন্ত্রণায় মিছিমিছি চেঁচাতে থাকো। তারপর আমি গিয়ে তোমাকে তামাশা দেখাবো।"

ব্রাহ্মণ তাই করল, কত ডাক্তার কত কবিরাজ এল কিন্তু কিছুতেই তার যন্ত্রণা আর কমলো না। মা হাহাকার করছে, স্ত্রী-পুত্রেরা কান্নাকাটি করছে—এমন সময়ে সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। তখন রোগীকে দেখে-শুনে সন্ন্যাসী বললেন—"এর রোগ ভয়ানক শক্ত ; রক্ষে পাবার কোন উপায় দেখছি না তবে একমাত্র যদি কেউ এর জন্যে আপনার প্রাণ দান করে তবেই ও এ যাত্রা রক্ষে পেতে পারে···।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সকলেই অবাক হ'ল। সন্ন্যাসী এবার রুগীর বুড়ো মাকে ডেকে বললেন—"মা, এই বুড়ো বয়সে তোর এই যোগ্য ছেলেকে হারিয়ে তোর আর বেঁচে থাকা আর না-থাকা দুই সমান। তা তুই যদি তোর এই ছেলের জন্যে তোর প্রাণটা দিতে পারিস তাহলে আমি তোর ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি। আর তুই যদি ওর মা হয়ে তোর প্রাণটা

দিতে না পারিস তাহলে এ সংসারে আর কে দেবে বল… ?"

বুড়ি তখন কাঁদতে কাঁদতে বললে—"বাবা, তুমি আমায় যা বলবে তাই করবো, তবে প্রাণটা…এমন ছেলের জন্যে প্রাণটা কোন ছার—তবে কিনা এই ভাবি যে, কাচ্চাবাচ্চা-গুলোর কি হবে ? পোড়াকপাল আমার—তা না হলে এ গুলোকে পেটে ধরব কেন— ?"

শাশুড়ীর কথা শুনতে শুনতে রুগীর স্ত্রী চীৎকার করে কেঁদে উঠল—"মাগো, বাবা গো তোদের প্রাণে দাগা দিয়ে আমি কি করে চলে যাবো গো… ।"

এইবার সন্ন্যাসী সেই স্ত্রীটিকে বললেন—"এর মাও এর জন্যে নিজের প্রাণ দিতে পারলে না, তা তুমিও এর স্ত্রী, স্বামীর জীবন রক্ষার জন্যে তোমার জীবনটা কি দিতে পারবে— ?"

স্ত্রী উত্তর দিলে—"অভাগী আমি, আমার পোড়াকপালে যাই আছে তাই হোক আর আমি মিছামিছি আমার বাপমাকে কাঁদাবো কেন— ?"

যখন এই রকম ভাবে সকলেই একে একে এড়িয়ে গেল তখন সন্ন্যাসী রুগীকে

বললেন—দেখলে ত তোমাব জন্যে কেউ কি প্রাণ দিতে চাইলে, বুঝলে ত এখন এ সংসাবে কেউ কাবো নয় ।

এই সব দেখে শুনে ব্রাহ্মণ আব কিছুই বললে না সন্ন্যাসীব সঙ্গে ঘব ছেড়ে চলে গেল ॥

অভিমান থাকা উচিত নয়

৩১

এক কথায় বলা হয়—নারদেব মত ভক্ত আব ভগবানের নেই। তাই নাবদের মনেও কখন সেই অভিমান হয়েছিল যে তিনিই বুঝি সেবা ভক্ত ভগবানের। নারায়ণ একদিন নাবদেব মনের কথা জানতে পেরে নারদকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। খানিক দূর গিয়ে নারদ এক বামুনকে দেখতে পেলেন—সেই লোকটা শুক্‌নো ঘাস খাচ্ছে—আব তার কোমরে একটা তরোয়াল বাঁধা রয়েছে। বামুনের শুক্‌নো ঘাস খাওয়া দেখে নারদ বুঝলেন যে লোকটি পরম বৈষ্ণব তাই তিনি জীব হিংসা করেন না। যে সব ঘাসে জীবন আছে সে সব ঘাস না খেয়ে তিনি শুক্‌নো ঘাস খাচ্ছেন! এমনতর বৈষ্ণব যিনি তাঁর কোমরে কেন তরোয়াল ঝুলছে, একথা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন। নারায়ণ নারদকে বললেন—"তুমি নিজেই

জিজ্ঞাসা কর না কেন··· !"
শেষে নারদ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি পরম বৈষ্ণব কিন্তু হিংসার আধাব তরোয়াল কেন রেখেছেন ? একদিকে অহিংসা অন্যদিকে হিংসা ব্যাপার কি ? আমি ত আপনার কিছুই বুঝতে পাবছি না— !"
নাবদের কথা শুনে বামুন উত্তর দিলে—"আমি তিন জনকে কাটবো বলে তরোয়াল রেখেছি ।"
নারদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন—'কাকে, কাকে ?'
বামুন বললে—"অর্জুন শালাকে প্রথমে কাটবো— ।"
নারদ ঘাবড়ে গিয়ে বললেন—'কেন ?'
বামুন বললে—"শালারএত বড় আস্পদ্দা যে, সে কিনা আমার ঠাকুরকে রথের সারথী করে রেখেছে··· !"
নারদ একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"আর কাকে— ?"

বামুন বললে—"দ্রৌপদী শালীকে !"
নারদ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"সে কি ! কেন··· ?"

বামুন বললে—"বেটির এতবড় আস্পদ্দা, সে আমার ঠাকুরকে পাতের এঁঠো খাওয়ায়-- ?"

[একদিন দুর্বাসা মুনি দশ হাজার শিষ্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে আতিথ্য গ্রহণ করতে গেলেন। তখন মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়। হঠাৎ এই অসময়ে দশ হাজার লোকের খাবাব ব্যবস্থা করা অসম্ভব এবং পাণ্ডবদের নিয়ম ছিল যে দ্রৌপদীর অন্ন গ্রহণের পর সেদিন কারুকে অন্নদান করা হত না। কারণ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অতিথি অভ্যাগতদের সকলকে খাইয়ে সবশেষে শেষান্ন গ্রহণ করতেন দ্রৌপদী। সুতরাং এই রকম বিপদে দ্রৌপদী বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তাছাড়া দুর্বাসামুনিও ভয়ানক রাগী ছিলেন, কোন একটু ত্রুটি বিচ্যুতি হলেই শাপ-শাপান্ত করতেন। দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। কৃষ্ণ তখন ভুক্তাবশিষ্ট (এঁঠো) এককণা তণ্ডুল ও ব্যঞ্জন কণিকামাত্র চাইলেন। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দ্রৌপদী একটি থালায় এককণা অন্ন ও এককণামাত্র শাক পেলেন, কৃষ্ণকে তাই এনে দিলেন। কৃষ্ণ তাই খেয়ে

 একটি প্রকাণ্ড ঢেঁকুর তুললেন। এদিকে দুর্বাসা

মুনি যে দশ সহস্র শিষ্য নিয়ে ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন তাঁরা স্নান সেরে ঘাটে বসেছিলেন। এরপর তাঁরা দুর্বাসামুনির সঙ্গে পাণ্ডবদের বাড়ীতে এসে আহার করবেন এই রকম কথা ছিল। কৃষ্ণ যেই প্রচণ্ড ঢেঁকুর তুললেন তখন দশ হাজার শিষ্যের এত পেট ভরে গেল যে তাঁরা সবাই নদীর তীরে শুয়ে পড়লেন এবং আর উঠে আসতে পারলে না। পরে তারা নিজেদের আস্তানায় ফিরে গেলেন। এইভাবে বিপদ কাটল]। এবপর নারদ ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আর কাকে ?' বামুন বললে—"নারদ শালাকে !"

নারদ এবারে মরিয়া, শুধলেন—"কেন ?"

বামুন উত্তরে বললে—"শালার নারদ, যখন তখন, দিন নেই রাত্তির নেই আমার ঠাকুরকে জাগায়··· !"

সত্যিই নারদ এবারে ব্রাহ্মণের ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তখন তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠ ভক্তের অভিমান আর রইল না। তাই তারে বাড়া, তারে বাড়া আছেই সুতরাং অভিমান রাখতে নেই ॥

নারদের মায়া দর্শন

৩২

দেবর্ষি নাবদ একবার নাবায়ণকে বলেছিলেন—"ঠাকুর তোমাব যে অঘটন-ঘটন-পটীযসী মায়া, তাকে একবাব আমাকে দেখাও··· ।"

নারায়ণ নারদকে বললেন—"তথাস্তু !"

পরে একদিন নাবায়ণ নারদকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর এসে নারায়ণ খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। তিনি জলের জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন শেষে নারদকে বললেন—"নারদ যেখান থেকে পাও আমায় একটু জল এনে বাঁচাও ।"

নারদ তাড়াতাড়ি একটু জল পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু কাছে কোথাও জল নেই তাই দূরে গিয়ে একটি নদী দেখতে পেলেন। নদীর কাছে গিয়ে নারদ একটি পরমা সুন্দরী কন্যা দেখতে পেলেন। তিনি মেয়েটির অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে একেবারে গলে গেলেন। নারদ মেয়েটির

কাছে যেতে মেয়েটি খুব মিষ্টি করে কথা কইতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যে দুজনের মধ্যে ভালবাসা হয়ে গেল। তারপর নারদ মেয়েটিকে বিয়ে করে সেইখানেই ঘর সংসার করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁদের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে জন্মাল। নারদও স্ত্রীপুত্র কন্যা নিয়ে পবম সুখে ঘরসংসার করছেন। এমন সময়ে সেখানে ভয়ানক মড়ক দেখা দিল। নারদ তখন ঠিক কবলেন তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে সে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাবেন। একদিন সবাইকে নিয়ে নারদ চলে যাবার জন্যে নদীর সেতুতে উঠে যেমন পার হতে যাবেন তখুনি একটি একটি করে নারদের সব ছেলেমেয়েরা জলে পড়ে গেল এমনকি স্ত্রীটি পর্যন্ত জলে পড়ে গেল এবং নারদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সকলেই জলে ডুবে মারা গেল। বেচারী নারদ শোকে আকুল হয়ে নদীর পাড়ে বসে শেষে হাপুস নয়নে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। সেই সময়ে নারায়ণ নারদের সামনে এসে বললেন—"কই নারদ আমার জল কই· · ?" নারদ অবাক হয়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে রইলেন। তখন তাঁর সব কথা মনে পড়ে

গেল—তিনি নাবায়ণকে বললেন—"ঠাকুব ! তোমার পাযে গড আর তোমার মাযাব পাযে গড় । আমি এবার তোমার মায়াকে হাডে হাড়ে চিনেছি· ।"

সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাকা চাই

৩৩

সবল বিশ্বাস ও অকপটতা থাকলে ভগবান লাভ হয় । সরলতা লাভ করা পূর্ব জন্মের তপস্যা না থাকলে হয় না—দেখ না ভগবান যেখানেই অবতীর্ণ হয়েছেন সেখানেই সরলতা । দশরথ কত সরল ! নন্দ ঘোষ কত সরল !

একদিন একটি সাধুর সঙ্গে একজন লোকের দেখা হয । সেই লোকটি সাধুর কাছে কিছু উপদেশ চায় । সাধুটি তখন লোকটিকে বললেন—তুমি মনপ্রাণ দিয়ে ভগবানকে ভালবাস··· ।”

লোকটি জানালে—“ঠাকুর, আমি ত ভগবানের কিছুই জানি না, তাঁকে কখনও দেখিনি আমি কি করে তাঁকে ভালবাসবো— ?”

তখন সাধু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি কাকে ভালবাসো— ?”

লোকটি ভেবেচিন্তে বললে—ঠাকুর, থাকবার মধ্যে আমার একটি মেড়া আছে, আমি তাকেই ভালবাসি । আমার আর কেউ নেই !”

সাধু তাকে উপদেশ দিলেন—“তুমি মন প্রাণ দিয়ে মেড়াটিকে ভালবাসবে, সেবাযত্ন করবে জানবে ঐ মেড়ার ভেতর ভগবানই আছেন… ।”

এই কথা বলে সাধু বিদায় নিলেন । আর তাবপর থেকে ঐ লোকটি মনপ্রাণ দিয়ে সেই মেড়াটির সেবাযত্ন করে এবং ভালবাসে, তার সরল বিশ্বাস যে ঐ মেড়ার ভেতর সত্যিই ভগবান থাকেন । এরপর বহুদিন কেটে গেছে হঠাৎ একদিন সেই সাধুটি সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ঐ লোকটির খোঁজ করতে লাগলেন । যখন লোকটির সঙ্গে দেখা হল তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি এখন কেমন আছ… ?”

লোকটি খুব খুশী হয়ে সাধুকে প্রণাম করে জানালো “গুরু ! আপনার আশীর্বাদে এখন খুব ভালই আছি । আপনি যেমন বলেছিলেন আমিও তেমনভাবেই মেড়াটির সেবাযত্ন করে ভালবাসি । এখন হয় কি ঐ মেড়ার ভেতর একটি কি সুন্দর মূর্ত্তি দেখতে পাই…তাঁর আবার চার হাত ! আমি তাঁকে দর্শন করে ভারী আনন্দ পাই।আমি এখন খুব সুখে আছি… ।”

ভিক্ষা খোদার কাছেই চাইব রাজার কাছে নয় ।

৩৪

এক বনে কুঠির তৈরী করে একটি ফকির বাস করতেন । ফকিবের কাছে অনেক লোকই আসা যাওয়া করত । একদিন ফকিরের ইচ্ছা হল যে তিনি অতিথি সৎকার করবেন কিন্তু অতিথি সেবা করতে হলেও টাকার দরকার তাই তিনি আর কি করেন বাদশাহের কাছে এসে উপস্থিত হলেন । দিল্লীর মসনদে তখন শাহেন শা আকবর বসেছেন—তাঁর কাছেও ফকির দরবেশদের অবারিত দ্বার, তাই ফকির আকবরশায়ের কাছে উপস্থিত হলেন । আকবর তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনলেন । আকবর সবশেষে বলছেন—" হে আল্লা, ধন দাও, দৌলৎ দাও... ।"

এই কথা শুনে ফকিরটি চলে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে আকবর তা দেখতে পেয়ে ইশারায় ফকিরকে যেতে নিষেধ করলেন । তারপর

নমাজ শেষ করে এসে তিনি ফকিবকে জিজ্ঞাসা কবলেন— "আপনি ত কিছু বলতেই এসেছিলেন কিন্তু না বলেই বা চলে যাচ্ছিলেন কেন— ?"

ফকির বললেন—"আমি শুনতে পেলুম তুমি বলছ—'হে আল্লা ধন দাও, দৌলৎ দাও', তাই আমি বুঝলাম তুমি দৌলতেব ভিখাবী। আমিও কিছু তোমাব কাছ থেকে টাকা নিতেই এসেছিলুম কিন্তু আমি যখন এসে দেখলাম তুমিও অর্থ চাইছ তখন অ'মি ভাবলুম ভিখাবীব কাছে ভিক্ষা চেয়ে কি হবে তাব চেযে ববং খোদাব কাছেই চাইব। এই ভেবেই আমি চলে যাচ্ছিলুম।"

এক কৌপীনকাওয়াস্তে

৩৫

গুরুর উপদেশ মত—সাধন ভজন করবার উদ্দেশ্যে এক সাধু কোন একটি গ্রামের নির্জন প্রান্তরে পর্ণ কুটির বেঁধে বাস করতে লাগলেন এবং সেখানে থেকে তিনি নিয়মিত সাধনভজন করতে লাগলেন। সাধুটি প্রতিদিন ভোরে স্নান সেরে তাঁর ভিজে কাপড় (বহির্বাস) এবং কৌপীনটি কুটিরের কাছে একটি গাছে শুকোতে দিয়ে গ্রামে ভিক্ষা করতে যান। এই সময়ে ইঁদুরের উপদ্রব হতে লাগল—সাধুটি বেরিয়ে গেলে রোজ ইঁদুর এসে তাঁর কৌপিন কেটে দিয়ে যেত। তার জন্যে সাধুকে আবার গ্রাম থেকে কৌপীন ভিক্ষা করে আনতে হত। অল্পদিনের মধ্যে আবার ইঁদুর নতুন কৌপীনটি কেটে দিত। শেষে সাধুটি বিরক্ত হয়ে ভাবলেন যে কে তাঁকে রোজ রোজ কৌপীন ভিক্ষা দেবে? তখন তিনি গ্রামবাসীদের ইঁদুরের উপদ্রবের কথা জানালেন। তারা ব্যাপারটা

শুনে বললে—"তাই ত রোজ কে আপনাকে কৌপীন ভিক্ষা দেবে ? তার চেয়ে আপনি একটি বেড়াল পুষুন।"
সাধুটিও তাদের কথামত একটা বেড়ালেব বাচ্চা নিয়ে এলেন, সেই বেড়ালকে দেখে ইঁদুর জব্দ হল,সাধুটির আব আনন্দ ধরে না। তিনি বোজ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বেড়ালের খাবার জন্যে দুধভিক্ষে করে আনতেন। একদিন একজন সাধুটিকে বললে—"সাধুজী,কে আপনাকে রোজ বেড়ালের জন্যে দুধ ভিক্ষে দেবে ? তার চেযে আপনি ববং একটা গাই পুষুন তা হলে বেড়ালেরও হবে আপনিও একটু খেতে পাবেন।" সাধুও ভাবলেন 'তাই ত ঠিক কথা', তারপর তিনি একটি দুধেলা গরু সংগ্রহ করে পুষতে আরম্ভ কবলেন। কিন্তু গরু পুষলেই চলবে না, তার খাদ্য চাই, সেই খড়, বিচুলী চাই, সুতরাং তাঁকে আবার গ্রামবাসীদের কাছে যেতে হল। একদিন তারা সাধুকে বললে—"সাধুজী, আপনার গরুর জন্যে ত রোজ খড়, বিচুলী দরকার তাহলে আপনার বাড়ীর সামনে যে পতিত জমি আছে—আপনি সেখানে চাষ
 করুন তাহলে আর রোজ আপনাকে গরুর খাদ্য

ভিক্ষে করে আনতে হবে না ।"
সাধুটিও বুঝলেন । তাই সকলের কথামত কুটিরের কাছে পতিত জমিতে চাষ আবাদ আরম্ভ করলেন । চাষের কাজের জন্য তাঁকে লোকজনও রাখতে হল । আবার জমি থেকে ধান উঠতে লাগল তখন ধান রাখবার জন্য গোলাবাড়ী তৈরী করতে হল । সাধুটির সাধন ভজন গেল ।'তিনি এখন ক্ষেত খামার, লোকজন নিয়ে গৃহস্থের মত মহাব্যস্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন । হঠাৎ একদিন সেখানে সাধুর গুরুদেব এসে হাজির হলেন । তিনি শিষ্যকে দেখতে না পেয়ে একটি চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে যে এক সাধু একটি কুটিরে বাস করতেন তিনি কোথায়— ?"
চাকর কোন উত্তর দিতে পারলে না । গুরু তখন সাধুর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন ।সেখানে শিষ্যকে সামনে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"বৎস, এসব কি··· ?"
শিষ্য খুবই অপ্রতিভ হয়ে গুরুর পায়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন·—"প্রভুজী, এসবই এক কৌপীনকাওয়াস্তে— ।"
তারপর শিষ্যটি তাঁকে একে একে সব ঘটনা

বলতে লাগলেন। শিষ্যের গুরুর দর্শন হওয়ায় তাঁর সব মায়া কেটে গেল। তিনি আসক্তিশূন্য হয়ে বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে গুরুব পিছনে পিছনে আবার পথে নাবলেন।

ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি

৩৬

ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রহ্লাদের ছিল। ভগবানকে কি কারণে ডাকা, তাঁকে লাভ করেই বা কি ফল, এর কোন কারণ জানা নেই, অথচ তাঁকে না ডেকে কিছুতেই প্রাণ মন স্থির থাকে না, তাঁকে সর্বস্ব সমর্পণ না করে হৃদয় মানে না, এই রকম ভক্তিকেই অহৈতুকী বা হেতুশূন্য ভক্তি বলে। ভক্ত প্রহ্লাদের ভক্তি ছিল এই রকম। প্রহ্লাদ কখন কারো কাছে হরিগুণ-গান—শোনেননি। হরিনাম করলে এ ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, বার বার আসতে হয় না, মহামায়ার মায়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিম্বা হরিনাম করলে সংসারে থেকে রাজা হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সম্ভোগ করতে পারা যায় এরকম কোন কথাই, কোন কামনাই তাঁর মনে জাগেনি। প্রহ্লাদের মনপ্রাণ সর্বদাই হরিনাম শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকত তাই তিনি হরিনাম সব সময়ে করতেন।

হরিকেই তিনি একমাত্র আপনার হতে আপনার ভাবতেন, তাই হরির প্রতিই ছিল তাঁর পূর্ণ ভালবাসা। বাবার শাসন, মায়ের কান্না, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদের নানা বিধি-নিষেধ কিছুতেই প্রহ্লাদকে টলাতে পারেনি। সর্বদাই তাঁর মন হরি-পাদপদ্মে মগ্ন থাকত এমনকি তাঁর নিজের প্রাণের মায়াও ছিল না। প্রহ্লাদ, রাজা হিরণ্যকশিপুর একমাত্র ছেলে। রাজা নিজে অত্যন্ত হরি-বিদ্বেষী ছিলেন তাই ছেলের ওপর নানা নির্যাতন করে তাঁর হবিভক্তি বন্ধ করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু প্রহ্লাদ হরিব নাম স্মরণ করতে করতে সব অত্যাচার সহ্য কবতেন। শেষে একদিন রাজা হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডেকে বললেন—"তুই অন্য যে কোন নাম কর, ঐ হরির নামটা বাদ দে, ঐটাই আমার অসহ্য।"

প্রহ্লাদ তখন নম্রভাবে বাবাকে বললেন—"বাবা, আমি কি করব বল, আমি কি ইচ্ছায় হরি নাম করি, আমি হরিকে ডাকবো বলে ডাকি না। কেন জানি না আমার মনপ্রাণ সর্বদা হরির দিকে টানছে। আমি যেন তাঁর কথা শুনতে, বলতে আত্মহারা হয়ে যাই! হরি যে আমার ভেতরে,

বাইরে পূর্ণ হয়ে আছেন। আমি কি করে তাঁকে ছাড়ব বল— ?”

এই রকম অহেতুক ভালবাসায় প্রহ্লাদের অন্তর পূর্ণ ছিল ॥

রামের ইচ্ছায়

৩৭

এক গ্রামে এক তাঁতি বাস করত। গ্রামের সব লোক সেই তাঁতিকে খুব ভালবাসত। তাঁতি লোকটি ভারী ধার্মিক ও সরল প্রকৃতির ছিল, তাই সকলে তাকে খুব বিশ্বাসও করত। সে হাটে কাপড় বিক্রী করত। খরিদ্দার কাপড়ের দাম জিজ্ঞাসা করলে সে বলত—"রামের ইচ্ছায় কাপড়ের দাম এক টাকা, রামের ইচ্ছায় মেহনতের দাম চার আনা, রামের ইচ্ছায় লাভ—দু আনা, রামের ইচ্ছায় কাপড়ের দাম এক টাকা ছ আনা।"

লোকে তার কথায় বিশ্বাস করে কাপড়ের দাম ফেলে দিয়ে কাপড় নিয়ে চলে যেত। লোকটি গভীর রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ করে অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে রামের কথা ভাবত। একদিন সে অনেক রাত পর্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক খাচ্ছিল তার ঘুমও আসছিল না। সেই সময়ে

 হঠাৎ একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে ডাকাতি

করতে যাচ্ছিল, ডাকাত দলে একটা মুটের অভাব ছিল তাই তারা তাঁতিকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল। তারপর ডাকাতেরা এক গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি করে সেই সব মাল তাঁতির মাথায় তুলে দিলে ঠিক তেমন সময়ে পুলিশ এসে হাজির। ডাকাতেরা সবাই যে যেমন পারল চোঁ চোঁ দৌড় মারল আর ডাকাতির সব মাল মাথায় নিয়ে ধরাপড তোপড় সেই তাঁতি বেচারীই ধরা পড়ল। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। পরদিন গ্রামের সব লোক সেই খবর পেয়ে ছুটল হাকিমের কাছে।তারা হাকিমকে বললে—"এ লোক অত্যন্ত ধার্মিক এ কখনই ডাকাতি করতে পারে না।" হাকিম তখন তাঁতিকে আগাগোড়া ঘটনাটা বলতে বললেন। তাঁতি বলতে লাগল—"হুজুর! রামের ইচ্ছায় আমি রাতে ভাত খেলুম। তারপর চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক খেলুম, রামের ইচ্ছায় বসে ঈশ্বর চিন্তা করতে লাগলুম, রামের ইচ্ছায় আরো রাত হয়ে গেল। এমন সময়ে রামের ইচ্ছায় একদল ডাকাত আমায় ধরে টেনে নে গেল। তারা রামের ইচ্ছায় এক বাড়ীতে ডাকাতি করলে, রামের ইচ্ছায় তারা আমার মাথায় ডাকাতির

সব মাল তুলে দিলে। এমন সময়ে পুলিশ এসে পড়ল। রামের ইচ্ছায় ডাকাতেরা সব পালিয়ে গেল। রামের ইচ্ছায় আমি ধরা পড়লুম। রামের ইচ্ছায় কাল রাতে হাজতে থাকলুম। আর আজ সকালে রামের ইচ্ছায় আমাকে হুজুরের কাছে নিয়ে এসেছে— ।"

—হাকিম তাঁতিকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলেন। তাঁতি রাস্তায় এসে তার বন্ধুদের বলতে লাগল—"রামের ইচ্ছায় আমাকে ছেড়ে দিলে… !"

যথার্থ ভাগবত পাঠ

৩৮

এক ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীতে গিয়ে রাজাকে বললেন—"মহারাজ আমি আপনাকে ভাগবত পাঠ শোনাব।" ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে, আপনার এখনও ভাল করে ভাগবত বোঝা হয়নি এখন আপনি ভাল করে পাঠ করুন পরে আমাকে শোনাবেন... ।" রাজার কথায় ব্রাহ্মণ মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবলেন—"রাজা আমায় বলে কি না ভাল করে ভাগবত আবার পাঠ করতে ! আমি কি না এত কাল ধরে ভাগবত পাঠ করে আসছি...রাজা কি নির্বোধ !" ব্রাহ্মণ মহা চটে গেলেও রাজাকে মুখে কিছু বলবার সাহস হল না,তিনি বাড়ী ফিরে এলেন । তারপর বাড়ী এসে ভাগবতটি খুলে পাঠ করেন আর হাসেন, মনে মনে ভাবেন "রাজা কি নির্বোধ ! আমার বুঝতে কি কিছু আর বাকী আছে— ?"

কিছুদিন পরে আবার তিনি রাজার কাছে গিয়ে বললেন—"মহারাজ ! এইবার আপনি আমার

ভাগবত পাঠ শুনুন··· ।”
কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণকে আবার বললেন—“আজ্ঞে, আপনি ভাল করে পাঠ করে আসুন তারপর আমি শুনবো— ।”
ব্রাহ্মণ রাজার কথায় মহাবিরক্ত হলেও কোন উত্তর দিতে পারলেন না তিনি বাড়ী ফিরে এলেন । কিন্তু ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবতে লাগলেন “রাজাই বা বার বার একথা বলছেন কেন নিশ্চয়ই এর কোন অর্থ আছে ! আশ্চর্য ! এবারে তিনি যতই ভাগবত পাঠ করেন ততই তার নতুন নতুন ভাবের উদয় হয় আর তিনি ভাবে বিভোর হয়ে আপনা আপনি ঘরে বসে ভাগবত পাঠ করেন আর কেঁদে আকুল হন । তিনি আর রাজবাড়ীতে যান না । বেশ কিছু দিন ব্রাহ্মণকে রাজবাড়ীতে আসতে না দেখে রাজা ভাবলেন যে, সে ব্রাহ্মণ কেন আসে না ? তারপর রাজা একদিন নিজে তাঁর বাড়ীতে গেলেন । রাজা এসে দেখলেন যে ব্রাহ্মণ ভাগবত পাঠ করছেন আর হাপুস নয়নে কাঁদছেন । তখন রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন—“ঠাকুর, এইবার আপনার যথার্থ
 ভাগবত পাঠ করা হয়েছে— !”

ঘর সংসার করা হল না কেন— ?

৩৯

একদিন এক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা
করলেন—"আপনি স্ত্রী নিয়ে ঘর সংসার
করলেন না কেন... ?"
ঠাকুর তার উত্তরে এই গল্পটি
বললেন—"কার্ত্তিক একদিন একটা বেড়ালকে
নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছিল। পরদিন
কার্ত্তিক তার মায়ের গালে সেইরকম একটা
আঁচড়ের দাগ দেখে মাকে জিজ্ঞাসা
করল—"মা তোমার গালে এরকম নখের
আঁচড় এল কি করে-– ?"
মা-দুর্গা বললেন—"বাবা, এত তোমারই নখের
আঁচড়ের দাগ !"
কার্ত্তিক মায়ের কথা শুনে অবাক হয়ে
বললে—"তা আমার নখের দাগ তোমার মুখে
আসবে কেন... ?"
মা-দুর্গা বললেন—"বাবা, কাল যে তুমি একটা
বেড়ালকে নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছিলে মনে
আছে কি ?"

কার্ত্তিক আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ, আমি একটা বেড়ালকে গতকাল আঁচড়ে দিয়েছিলুম ঠিকই কিন্তু সে দাগ তোমার গালে হলো কি করে... ?"

মা-দুর্গা বললেন—"দেখ বাবা, আমি ছাড়া ত' এ জগতে কিছু নেই, জীবজন্তু সবই আমি, তা ছাড়া কিছু নেই... ।"

মায়ের কথা শুনে কার্ত্তিক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে তিনি বিবাহ করবেন না । কেন না স্ত্রীলোক দেখলেই তাঁর মাতৃদর্শন হত ।

শেষে ঠাকুর বললেন—"আমার দশাও ঐ কার্ত্তিকের মতনই । স্ত্রীলোক দেখলেই আমার মাতৃদর্শন হয় তখন ঘর সংসার আর কি করবো বল— ?"

বালকের মত সরল বিশ্বাস চাই

৪০

জটিল নামে একটি ছোটছেলে ছিল। রোজ সে একা একা যখন বনের পথ দিয়ে পাঠশালায় যেত তার খুব ভয় করত। সে একদিন তার মাকে সেকথা বলতে তার মা তাকে বললে—"ভয় কি তোর ? তোর ভয় করলে তুই মধুসূদনকে ডাকবি। দেখবি সে এসে তোকে সঙ্গে করে পাঠশালায় পৌঁছে দেবে— ।"

জটিল তখন তার মাকে জিজ্ঞাসা করল—"মধুসূদন কে হয় মা— ?"

তার মা তাকে বললে—"মধুসূদন তোর দাদা হয়— ।"

ছেলেটি সরল মনে বিশ্বাস করলে যে তার মধুসূদন নামে একজন দাদা আছে সে বনের ভেতর থাকে। ছেলেটির যখন বনের পথ দিয়ে যেতে ভয় করতে লাগল সে তখন "মধুসূদন দাদা, মধুসূদন দাদা," বলে চেঁচিয়ে ডাকতে

লাগল কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে জটিল যখন বলতে লাগল—"মধুসূদন দাদা, মধুসূদন দাদা তুমি কোথায় আছ আমার বড্ড ভয় করছে যে…" এই বলে সে যখন কাঁদতে লাগল তখন মধুসূদন দাদা না এসে আর থাকতে পারলেন না।

"এই যে আমি, তোমার ভয় কি, তুমি যখনই ডাকবে আমি তখনই আসবো…. ।"

এই কথা বলে তিনি জটিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তার হাত ধরে সঙ্গে করে পাঠশালার কাছে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিলেন। তাই, বালকের মত সরল বিশ্বাস চাই। তাহলেই তাঁকে লাভ করা যায় ॥

ভগবান সরলতা ও ভক্তির বশ

৪১

শ্রীরঙ্গদেশে এক মূর্খ ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি রোজ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়টি পাঠ করতেন আর অনবরত কাঁদতেন। কিন্তু তিনি গীতার শ্লোকগুলি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারতেন না বা তিনি যা পড়তেন তার মানেও বুঝতে পারতেন না। এই জন্যে তিনি সেখানে সকলের কাছে উপহাসের পাত্র ছিলেন তবে তিনি তাদের নিন্দা বা উপহাসকে গ্রাহ্য করতেন না। আপন মনে তিনি রোজ মন্দিরে বসে গীতাপাঠ করতেন আর আনন্দে তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপ ত্যাগ করে যখন নীলাচলে যান পরে সেখান থেকে তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি যখন শ্রীরঙ্গপত্তমে (শ্রীরঙ্গদেশ) আসেন তখন ঐ ব্রাহ্মণের কথা সকলের মুখে শুনতে লাগলেন, তিনি ব্রাহ্মণের সঙ্গে একদিন দেখা

করতে গেলেন। মন্দিরে বসে ব্রাহ্মণ নিয়মিত আপন মনে গীতাপাঠ করছেন আর অঝোরে কাঁদছেন।শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেখানে গিয়ে ব্রাহ্মণের পাঠ শোনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি গীতা পড়ে এত আনন্দ পাও কেন— ?"

ব্রাহ্মণ তখন উত্তর দিলেন—"আমি গুরুর আদেশে গীতাপাঠ করি। আমি যে গীতা পড়ি আমি তার মানেও বুঝি না আর আমি জানি আমার উচ্চারণও শুদ্ধ নয় তবে আমি কেন পড়ি....এই কারণে যে আমি যতক্ষণ পাঠ করি আমি দেখি যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথে বসে তাঁকে (অর্জুনকে) উপদেশ দিচ্ছেন আর সেই দৃশ্য দেখে আনন্দে আমার বুক ভরে ওঠে, তাই আমার দু'চোখে জল আসে... !"

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রাহ্মণের কথা শুনে আনন্দে তাঁকে আলিঙ্গন দান করলেন এবং বললেন—"তুমিই যথার্থ গীতাপাঠের অধিকারী, তুমিই গীতার সারমর্ম বুঝেছ... !"

দলের লোকই দলের লোককে চিনতে পারে

৪২

সাধু হলেই সাধুকে চিনতে পারে। গরুর দলে অন্য গরু ঢুকলে তাকে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তবে যদি গরু আসে তবে সকলে এসে তার গা চাটতে আরম্ভ করে। সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখা হয় তখন তারা উভয়ে উভয়কে চিনতে পারে এবং আনন্দ পায়। আর তখন তারা সে সঙ্গ ছাড়তে চায় না কিন্তু অভক্ত এলে তার সঙ্গে মেলামেশা করে না। তাই ভক্ত বা সাধু হলেই তারা পরস্পর নিজেদের দলের লোককে চিনে নিতে পারে। যেমন যে সুতোর কাজ করে সে সুতো দেখলেই বলে দিতে পারে যে কত নম্বরের সুতো।

একজন সাধু সমাধিস্থ অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়েছিলেন। সেই সময়ে একজন চোর তাই দেখে নিজে নিজে বলতে লাগল—"এ ব্যাটা নিশ্চয়ই চোর, সারারাত্তির চুরি করে এখন

রাস্তার ধারে পড়ে আছে আমি পালাই বাবা !"
এই বলে সে পালাল । একজন মাতাল
সাধুটিকে সেই অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে
দেখে বলতে লাগল—"হ্যাঁ বাবা, সারারাত্তির
মাল টেনে টেনে খানায় পড়ে গেছে । আমি
বাবা কেমন আছি,পড়ছিনি— ।"
পরে একজন সাধু সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে
সমাধিস্থ সাধুটিকে দেখতে পেয়ে তাঁর সমাধির
অবস্থা বুঝতে পেরে এগিয়ে এসে তাঁর পদসেবা
করতে লাগলেন ।
তাই দলের লোকই দলের লোককে চিনতে
পারে ॥

রাজবাড়ীতে লাউ কুমড়ো ভিক্ষে করতে নেই

৪৩

রাজবাড়ীতে ভিক্ষে করতে গিয়ে যে লাউ কুমড়োর মতন সামান্য জিনিস চায় তার মতন নির্বোধ আর হয় না। রাজাধিরাজ ভগবানের দ্বারে গিয়ে যে জ্ঞানভক্তির মতন রত্ন প্রার্থনা না করে—অষ্টসিদ্ধাই প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিস প্রার্থনা করে, যেমন ডাকাতেরা ডাকাতি করবার আগে কালীপূজা কোরে "জয় কালী" বলে হুঙ্কার করে তারা যে কত নির্বোধ তা বলা যায় না। এও তাই।

যেমন বড়লোক বাবুর কাছে এসে অনেকেই অনেক রকম কামনা করে অর্থাৎ চায় কিন্তু কেউ যদি এসে কিছু না চায় অথচ রোজ আসে, বাবুকে ভালবাসে বলে তাঁকে দেখতে আসে তাহলে বাবুরও ভালবাসাটা তার ওপরেই পড়ে। প্রহ্লাদের যেমন ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভালবাসাই ছিল।

যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ

৪৪

এক সন্ন্যাসী একটি শিবমন্দিরের পাশে আস্তানা করে সেখানে বাস করতেন—আর ঠিক তার সামনের দিকের বাড়ীতে একজন মন্দ স্ত্রীলোক থাকত। তার বাড়ীতে রাতদিন লোক আসে—তাই দেখে সন্ন্যাসীর মনে দুঃখ হত। শেষে একদিন সন্ন্যাসী সেই স্ত্রীলোককে ডেকে বললেন—"দেখ তুই ভারী পাপী, রাতদিন যদি তুই পাপ কাজই করিস তাহলে তোর দশা কি হবে?"

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সেই স্ত্রীলোকের মনে আঘাত লাগল এবং নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে ভগবানকে ডাকতে লাগল। সেই থেকে সে পেটের দায়ে যখনই খারাপ কাজ কবত তখন কাতরভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাত।

এরপর সন্ন্যাসী মনে মনে ঠিক করলেন যে ঐ মেয়েলোকের বাড়ীতে রোজ কত লোক আসে

তার একটা হিসেবনিকেশ রাখতে হবে ফলে
তিনি তখন থেকে রোজ যত লোক আসে তত
ঢিল গুণে গুণে জমিয়ে রাখতে লাগলেন।
এইরকম করতে করতে অনেক ঢিল জমতে
লাগল। পরে একদিন সেই স্ত্রীলোককে দেখতে
পেয়ে সন্ন্যাসী বললেন—"দেখ দেখি, তুই এই
কদিনে কত রাশি রাশি পাপ করেছিস!" এই
কথা বলে তিনি সেই ঢিলের কাঁড়ি দেখালেন
তারপর বললেন—"তা, এখনও বলি তুই
সাবধান হ…।"
সেই ঢিলের কাঁড়ি দেখে স্ত্রীলোকটি কাতর
প্রাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে
লাগল—"হে ভগবান আমাকে মুক্ত কর…!"
এরপর একদিন দেখা গেল সেই সন্ন্যাসী এবং
মন্দ মেয়েলোকটির একই দিনে মৃত্যু হল।
যমদূতেরা এসে সন্ন্যাসীকে ধরে ফেললে আর
বিষ্ণুদূতেরা এসে মন্দ মেয়েলোকটিকে ধরলে।
তাই দেখে সন্ন্যাসী (আত্মা) যমদূতদের
বললেন—"তোমরা ভুল করেছ, তোমরা ঐ নষ্ট
মেয়েকে ধরবে আর আমাকে বিষ্ণুদূতেরা
ধরবে…।"
সন্ন্যাসীর কথা শুনে তখন যমদূতেরা

বললে—"না, আমরা ভুল করিনি, আমরা ঠিকই করেছি কেননা ঐ নষ্ট স্ত্রীলোক ভগবানের নাম ঠিক ঠিক করেছে আর তুমি সন্ন্যাসী হয়েও ভগবানের নাম কবনি, করেছ নষ্টামি। দেখ যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ, তাই হল কি না এবারে বুঝে দেখ— !"

বৃথা তর্কে লাভ কি… ?

৪৫

একবার—কোলকাতার এক বিখ্যাত ধনী ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিল। লোকটি সোজা কথায় ভক্তি বা ভাগবত প্রসঙ্গ না করে ঠাকুরের সঙ্গে নানা কূটতর্ক আরম্ভ করে। ঠাকুর তার কথা শুনে বললেন—"বৃথা তর্কে লাভ কি ? সরলভাবে তাঁকে ডেকে যাও, তাহলে তোমার নিজের কাজ হবে। ভগবানই সারবস্তু, তাঁকে লাভ করা, তাঁকে জানাই সব, তর্কের দরকার কি… ?"

ঠাকুরের কথায় দাম্ভিক প্রকৃতির লোকটির যেন তাতে তার দম্ভে আঘাত লাগল, তিনি তখন বললেন—"আপনিই কি সব জানতে পেরেছেন— ?"

শ্রীশ্রীঠাকুর তৎক্ষণাৎ তমগুণী লোকটির কাছে বিনীতভাবে হাতজোড় করে তাকে বললেন—"আমি কিছুই জানতে পারিনি সত্যি, তবে ঝাঁটা যেমন নিজে অপবিত্র হয়েও তবু

জায়গা জমি ঝাঁট দিয়ে সেই স্থানকে পবিত্র করে—সেই তেমন আর কি !"

ঠাকুরের সহজ সরল অকাট্য যুক্তির উত্তরে কূটতার্কিক লোকটি একেবারে চুপ হয়ে গেল, কোন কথাই বলবার সূত্র খুঁজে পেলে না ॥

ঈশ্বর কি সংসার ছাড়া— ?

৪৬

অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ চিন্তায় আকুল···তাঁর বড়ছেলে শ্রীরামচন্দ্র, সংসার ত্যাগ করে চলে যাবেন ! কারণ রামচন্দ্র গুরুর কাছে বেদ পড়ে সংসারকে অসার জেনেছেন, সংসার যদি স্বপ্নবৎ হয়, অসার হয় তবে তাকে ত্যাগ করাই উচিত তাই তাঁর সংসার-বৈরাগ্য এসেছে। রামচন্দ্রের জন্যে দশরথের বড় ভয় হল—তিনি তখন ছেলেকে বোঝাবার জন্যে গুরু বশিষ্ঠদেবকে ডেকে পাঠালেন। রাজগুরু বশিষ্ঠদেব রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন, তখন রাজা দশরথ স্বয়ং তাঁকে পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে বন্দনা করলেন এবং রাজা তাঁর সর্বজনের দুঃখের কথা গুরুকে নিবেদন করলেন। তারপর বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করতে বসলেন। তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কেন সংসার ত্যাগ করবে— ?"

রাম বললেন—“ যে সংসার স্বপ্নবৎ, তাকে অসার জেনেই ত্যাগ করতে চাইছি— ।”
বশিষ্ঠদেব বললেন—“তুমি আমায বুঝিয়ে দাও যে সংসার ঈশ্বর ছাড়া । তুমি আমায় যদি বুঝিয়ে দিতে পারো যে ঈশ্বর থেকে সংসার হয়নি তাহলে তুমি সংসার ত্যাগ কবতে পারো । এ জগৎ যদি তাঁরই সৃষ্টি হয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যদি তিনিময় হয় অর্থাৎ সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ তাহলে সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া··· ?”
শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবের কথার আর কোন উত্তর দিতে পারলেন না, তিনি নীরব হযে রইলেন ॥

হাতী নারায়ণ মাহুত নারায়ণ

৪৭

সব জলই জল—তবে সব জল খাওয়া যায় না। সব জায়গায় নারায়ণ আছেন কিন্তু সব জায়গায় যাওয়া যায় না। একদিন এক গুরু শিষ্যকে বললেন—"সব পদার্থ নারায়ণ!" শিষ্যও সেকথা বুঝলেন যে সমস্ত কিছুর মধ্যেই নারায়ণ আছেন।

একদিন শিষ্যটি যখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন দেখলেন যে একটা হাতী ছুটতে ছুটতে আসছে আর তার ওপর মাহুত বসে চীৎকার করছে—"সরে যাও, সরে যাও পাগলা হাতী যাচ্ছে—সরে যাও— ।" শিষ্য সেকথা শুনেও সরলো না। ভাবলে, আমি নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ তবে নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কি?"

শিষ্যটি সরলে না নির্ভাবনায় সে চলতে লাগলো,কিন্তু পাগলা হাতী কাছে এসেই তাকে শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে দূরে আছড়ে ছুঁড়ে ফেলে

দিলে। শিষ্যটির খুব চোট লাগলো। সে পরে গুরুর আস্তানায় ফিরে এসে গুরুদেবকে সব ঘটনা জানালো। গুরু শুনে বললেন—"তা ভালই হয়েছে। তুমিও নারায়ণ হাতীও নারায়ণ, আরো একটি নারায়ণ যে হাতীর পিঠে বসে তোমাকে সাবধান করলে সে কথা শুনলে না কেন ? সে যখন বল্লে 'পাগলা হাতী সরে যাও' তুমি সরলে না কেন ? সবই যদি নারায়ণ তাকে নারায়ণ ভাবলে না কেন— ?"

শিষ্যটির তখন টনক নড়লো..."তাইত, ঠিকত... !"

৪৮

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময়ে ভীষ্মদেব যখন শরশয্যায় শুয়ে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন তখন তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। পিতামহের চোখে জল দেখে অর্জুন খুব অবাক হয়ে গেলেন এবং ভাবতে লাগলেন যে ভীষ্মের মত এইরকম জ্ঞানবৃদ্ধ···তিনিও মৃত্যুর সময়ে মায়া-বদ্ধতায় অশ্রুপাত করছেন। শেষে অর্জুন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি কৃষ্ণকে বললেন—"হে সখা। কি আশ্চর্য····আমাদের বৃদ্ধ পিতামহ যিনি অষ্ট বসুর এক বসু, যিনি পরম জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং যিনি সব ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন তাঁর মত একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনিও মৃত্যুর সময়ে মায়াপরবশ হয়ে কাঁদছেন··· ?"
অর্জুনের কথা শুনে কৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভীষ্ম তখন কৃষ্ণকে বললেন—"কৃষ্ণ তুমি সর্বজ্ঞ। তুমি

সবই জানো যে কি কারণে আমি অশ্রু বিসর্জন করছি। আমি মায়ায় কাঁদছি না....আমি এই জন্যে কাঁদছি যে তোমার লীলা বোঝা ভার! কৃষ্ণ, তুমি স্বয়ং ভগবান, সেই তুমি পাণ্ডবদের বন্ধু এবং তুমি তাদের সারথীও বটে তবু পাণ্ডবদের দুঃখকষ্টের সীমা নেই! ভাবছি যে ভগবানের কাজ কিছুই বুঝতে পারলাম না তাই আমার চোখে জল... ।”

মারে হরি রাখে কে ?

৪৯

পিতৃসত্য পালন করতে রাম যখন চোদ্দ বছর বনে বাস করছিলেন সেই সময়ে রাক্ষস রাবণরাজা শ্রীরামের সহধর্মিনী সীতাদেবীকে হরণ করে নিয়ে যায় । ফলে রাম-রাবণে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে । সেই সময়ে একদিন শ্রীরামচন্দ্র বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে পড়েন তাই তিনি পম্পা সরোবরে জল খেতে নামলেন । সরোবরে নামবার আগে তিনি তাঁর ধনুকটি সরোবরের তীরে বিদ্ধ করে রাখলেন কিন্তু তিনি জানতে পারলেন না যে সেখানে একটি ব্যাঙ ছিল এবং সে ধনুক বিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত দেহে পড়ে রইল । জলপানের পর শ্রীরাম উঠে এসে ব্যাঙটিকে সেই অবস্থায় দেখে খুবই কাতর হলেন এবং মহাদুঃখিত হয়ে বললেন—"তুমি শব্দ করলে না কেন, তাহলে জানতে পারতাম, তোমার এ দশা হতো না ।" ব্যাঙটি বললে—" হে রাম ! আমরা যখন

বিপদে পড়ি বলি 'হে রাম রক্ষা কর, রক্ষা কর।' আর সেই রামই যখন মারেন তখন আর কাকে ডাকবো বল… ।"

সংসার আপনি পালিয়ে যায়

৫০

যতক্ষণ না সংসারে ভোগের বাসনা শেষ হয় ততক্ষণ কর্ম করা দরকার। একটা পাখী একবার একটা জাহাজের মাস্তুলের উপর বসেছিল তারপর যখন জাহাজটা চলতে চলতে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল তখন তার খেয়াল হল। চতুর্দ্দিকে কেবল জল আর জল তখন তার চমক ভাঙল, সে ডাঙায় উড়ে যাবার জন্যে উত্তর দিকে উড়ে গেল কিন্তু অনেক দূর গিয়েও সে কূল কিনারা পেল না তখন ক্লান্ত হয়ে সে ফিরে এসে মাস্তুলের ওপর বসে পড়ল। খানিকক্ষণ পরে সে উড়ে দক্ষিণ দিকে গেল কিন্তু সেখানও সে চারিদিকে জল দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ল কূল কিনারা না পেয়ে আবার ফিরে এসে মাস্তুলে বসে রইল। এবার সে অনেকক্ষণ জিরিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে উড়ে গিয়ে কোথাও কোন কূল কিনারা দেখতে না পেয়ে ফিরে এল। অগত্যা সে আর [জাহাজ

ছেড়ে পালাবার] কোনরকম চেষ্টা না করে নিশ্চিন্ত ভাবে মাস্তুলের ওপর বসে রইল। সেই রকম সংসার কি ছাড়তে হয়? সংসারে থেকে সাধনা করতে করতে সংসার আপনি পালিয়ে যায়।

তোমরা ভগবানে মন ঠিক রাখবে। স্ত্রীর সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কইবে। দুই, একটি সন্তান হওয়ার পর ভাইবোনের মত থাকবে।ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে তবে জীবের ভোগবাসনা যায় তখনই মুক্ত হতে পারে। সংসারে থেকে কর্ম করে যাও,কর্মেই কর্মের বন্ধন ক্ষয় হবে ॥

সংসারী জীবের ঈশ্বর লাভের জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত কথা—

৫১

ঈশ্বব এক বই দুই নয়।

যেমন জল—কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার, কেউ বলে জল। সেই একই জল তবে ভিন্ন ভিন্ন নামে। তেমনি একই সচ্চিদানন্দকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কেউ বলে হরি, কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে গড। সেই একই তিনি যে, যে নামে ডাকে ॥

ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন— ?

৫২

রাত্তিরে আকাশে কত তারা দেখ, সূর্য্য উঠলে আর তারা দেখতে পাও না বলে কি বলবে যে দিনের বেলায় আকাশে তারা নেই ? সেই রকম অজ্ঞান অবস্থায়, মায়ায় ঢাকা চোখ নিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে পাও না বলে কি বলবে—ঈশ্বর নেই··· ?

ঈশ্বর দর্শন হয় না কেন— ?

৫৩

একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে কেশব সেন বললে—ঈশ্বর দর্শন হয় না কেন— ? আমি বলি যে—লোকমান্য, বিদ্যা, এসব নিয়ে তুমি আছ কিনা তাই হয় না। ছেলে যতক্ষণ চুষী নিয়ে খেলা করে মা ততক্ষণ আসে না;যেই সে চুষিটি ফেলে দিয়ে চীৎকার করে কাঁদতে থাকে তখন মা ভাতের হাঁড়ি ফেলে দিয়ে ছুটে আসে। তখন এইসব ফেলে দিয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদবে তখন ঈশ্বর না এসে পারেন না।

ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ?

৫৪

তিনি বিষয়-বুদ্ধির অগোচর। আসক্তির লেশ থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ব্যাকুলতা হলে অরুণোদয় হল, তারপর সূর্য্য দেখা দেবেন। যার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে তার ঈশ্বর দর্শন হবেই হবে—ব্যাকুল হলে সমস্ত মনটা তাতে যায়। অনুরাগ হলেই ঈশ্বর দর্শন লাভ হয়।

অনুরাগের ঐশ্বর্য্য—বিবেক, বৈরাগ, জীবে দয়া, সাধু সঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণগান, সত্য কথা এইসব। যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হচ্ছে তার ঈশ্বর লাভের আর বড় দেরী নেই ॥

শাস্ত্র না পড়লে তাঁকে কি পাওয়া যায় না— ?

৫৫

প্রচারক বা বক্তা হতে গেলে শাস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মজ্ঞান এককথায় হয়। শাস্ত্র পড়ে হৃদ্দ—অস্তিমাত্র বোধহয় (ঈশ্বর আছেন এইমাত্র জানা যায়) ডুব দেবার পর তিনি জানিয়ে দেন তবেই সন্দেহ দূর হয়। শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশেল আছে তা থেকে চিনিটুকু লওয়া ভারি কঠিন। শাস্ত্রের মর্ম গুরুমুখে, সাধুমুখে জেনে নিতে হয়—তখন আর ও সবের দরকার হয় না। বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। তাঁর দর্শন পেলে বই, শাস্ত্র সব খড়কুটো বলে বোধ হয়।

সংসারে থেকে ধর্মকর্ম সম্ভব— ?

৫৬

সংসারে আছ, থাকলেই বা কি কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। নিজে কোন ফলের কামনা কোর না। আসক্তি নিয়ে সংসার করা [আমার, আমার এই মায়াবদ্ধতা] উচিত নয়। অনাসক্ত হয়ে সংসার থেকে কর্ম করলে আর 'এ সংসারও তাঁর, সব কাজও তাঁর' এই জ্ঞান লাভ করার পর সংসারে থাকলে ঠিক ঠিক ঈশ্বর লাভ হয় ॥

সংসার ও ঈশ্বর…দুটি কাজ একসঙ্গে সম্ভব ?

৫৭

সংসারের মধ্যে থেকে সাধনা করতে হলে আগে সংসারের খরচপত্তরের ঠিক করে বসতে হবে, তা না হলে তোমার সাধনায় ব্যাঘাত হবে। বাউল যেমন দু'হাতে দু'রকম বাজনা বাজায় আর মুখে গান করে, হে সংসারী জীব ! তুমিও হাতে কর্ম কর কিন্তু মুখে ঈশ্বরের নাম সর্বদা করতে ভুলো না।

সংসারে থেকে সব কাজ কর কিন্তু দৃষ্টি রেখো তাঁর দিকেই ॥

ঈশ্বরকে কিভাবে পাওয়া যায়— ?

৫৮

যেমন জ্ঞান বল্লেই কি জ্ঞান হয় ? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে । জ্ঞানেব দুটি লক্ষণ—প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্ববে ভালবাসা । শুধু জ্ঞান বিচার করছি কিন্তু ঈশ্বরে ভালবাসা নেই সে মিছে । আব এক লক্ষণ কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ । কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে ততক্ষণ জ্ঞান হয় না । যেই তার নিদ্রা ভাঙল অমনি পাবার জন্যে ব্যাকুলতা আরম্ভ হয় । ভেতরে ব্যাকুলতা নেই কিন্তু বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি—বিচার করছি, সেটা জ্ঞানের লক্ষণ নয় । আদতে ব্যাকুলতা চাই সরল ও অকপট মনে ঈশ্বরের জন্যে যে কাঁদতে পারে তাকে তিনি দেখা না দিয়ে পারেন না ॥

যদি বল সংসারী লোকেরা সব ছেড়ে তাকে চায় না কেন— ? সং সেজে আসরে নামলে কি সাজ ত্যাগ করতে পারে ? খানিকক্ষণ খেলা করুক । তারপর আপনি আপনি সাজ ছেড়ে

ফেলবে এখন। তবে যে তাঁকে চায় সে তাঁকে পায়—হয় না হয় করে দেখ। এ কলিকালে মানুষ তিন দিনে সিদ্ধি লাভ করে। তিন দিন যে রাতদিন তাঁর জন্যে ব্যাকুল হয়ে কাঁদবে, সে সিদ্ধ হবে।

আগে সাদাসিধে জ্বর হত—সামান্য পাঁচন খেলে রোগ ভাল হয়ে যেত কিন্তু এখন যেমন ম্যালেরিয়া, তার ওষুধও তেমন ডিঃ গুপ্ত। আগে লোক যোগযাগ তপস্যা এইসব করত। এখন কলির জীব অন্নগত প্রাণ, দুর্ব্বল প্রাণ, এখন একমাত্র হরিনামই সাধন।একমনে নাম করতে পারলেই হবে।

আগে মনটা শুদ্ধ করবার চেষ্টা কর। যেমন ময়লা আয়নাতে সূর্য্যের আলো পড়ে না কিন্তু পরিষ্কার হলে পড়ে। তেমনই মায়ামুগ্ধ ময়লা অপবিত্র মনে ঈশ্বরের আভা দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু যাঁরা বিশুদ্ধ আত্মা তাঁরা দেখতে পান। অতএব মনটা আগে শুদ্ধ কর। জানবে মনই সব।

যেমন ধর মনটা পড়েছে ছড়িয়ে, কতক গেছে ঢাকা—কতক গেছে দিল্লী—কতক গেছে কুচবিহার সেই মন কুড়িয়ে এক জায়গায়

আনতে হবে। সব মন কুড়িয়ে এক জায়গায় আনতে হবে তবে ত হবে। সব মন কুড়িয়ে এক জায়গায় না আনলে কি করে হবে ? ভাগবতে আছে শুকদেবের কথা। শুকদেব পথে যাচ্ছে যেন সঙীন চড়ান। কোন দিকে দৃষ্টি নেই এক লক্ষ্য, কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি, এক মন।

যেমন জ্ঞানই বল আর অজ্ঞানই বল সবই মনের অবস্থা···মনই সব। মানুষ মনেই বদ্ধ, মনেই মৃত, মনেই সাধু, মনেই অসাধু, মনেই পাপী, মনেই পুণ্যবান। এখন এই সংসারী জীব কি আর যোগযাগ করতে পারে ? তাই সংসারী জীব মনেতে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ মনন করতে পারলে তাদের আর অন্য কোন সাধনের দরকার হয় না। সর্বদা স্মরণ মনন করতে পারলে তাঁর কৃপাতেই তাঁকে লাভ করতে পারা যায়। আর ভগবান সরলতা প্রিয়—সৎপথে থেকে তাঁকে সরল ও শুদ্ধ মনে ব্যাকুল হয়ে ডাকো নিশ্চয়ই তাঁকে পাবে ॥

সব মানুষ কি ভগবানকে দেখতে পাবে— ?

৫৯

কোন লোক একেবারে উপোষী থাকবে না। তবে কিনা কেউ বা নটার সময়ে, কেউ বা দুটোর সময়ে, আর কেউ বা সন্ধ্যার সময়ে খায়। সেই রকম জন্মজন্মান্তরে কোন সময়ে না কোন সময়ে সকলেই ভগবানকে দেখবে ॥

তিনি ভক্তির বশ

৬০

ভগবান ভক্তির বশ। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য—এই সব তিনি চান। ভক্তিই সার। তাঁকে ভালবাসতে পারলে বিবেক, বৈরাগ্য এসব আপনিই আসে। ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। তাতে যদি ভক্তি হল ত—সবই হয়ে গেল আর কিছুরই দরকার নেই। ঈশ্বরেতে ভক্তি আছে তাঁকে জানবার ইচ্ছে আছে এরকম লোক ভক্তির

জোবে তাঁর পাদপদ্ম লাভ করে। যতক্ষণ তাঁর ওপর ভালবাসা না হয় ততক্ষণ কাঁচা ভক্তি আর তাঁর ওপর ভালবাসা হলে পাকা ভক্তি। কাঁচা ভক্তি ঈশ্বরীয় কথা, উপদেশ এ সব ধারণা করতে পারে না। পাকা ভক্তি হলে ধারণা হয়। কাঁচে যদি মশলা মাখান থাকে, তাহলে ছবি রয়ে যায় কিন্তু শুধু কাঁচে ছবি থাকে না ॥

ভক্তি লাভ কেমন করে হবে— ?

৬১

প্রথমে সাধু সঙ্গ করতে হয়। সৎ সঙ্গ করলে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হয় শ্রদ্ধা আসে। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা। নিষ্ঠার পর ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা যদি ভগবানের প্রতি হয় তবেই ভক্তি হয়। ভক্তিতে মনপ্রাণ একেবারে ভগবানে লীন হয়ে মিশিয়ে যায়। যখন বিষয় বুদ্ধি একেবারে চলে যায় ভগবানের প্রতি ষোল আনা মন হয় তখনই ভগবানের ওপর পূর্ণ ভালবাসা হয়। এই ভক্তিতেই ঈশ্বর দর্শন হয় ॥

ঈশ্বর দর্শন লাভ হলে কি হয়— ?

৬২

ঈশ্বর দর্শন লাভ হলে সংসার আসক্তি থাকে না। কাম-কাঞ্চনে উৎসাহ্ এসব একেবারে চলে যায়। কাঠ পোড়বাব সময়ে পড়্ পড়্ শব্দে আগুনের ঝাঁজ বেবোয় সব শেষ হয়ে গেলে তখন ছাই পড়ে যায়। আর কোন শব্দই নেই। তেমনি ঈশ্বর দর্শন লাভ হলে সংসার আসক্তিতে ছাই পড়ে যায়।

কাঁচা ঘিয়ে লুচি ফেললে কলকল শব্দ হয় কিন্তু ঘি যত গরম হয় শব্দ থাকে না। তেমনই মানুষের অল্প জ্ঞানে বাহ্য আড়ম্বর করতে ইচ্ছে হয় বক্তৃতা ইত্যাদি কিন্তু পুরোজ্ঞান হলে আড়ম্বর থাকে না। মানুষও তাই ক্রমে ঈশ্বরেব ভাবেতে ডুবে যায়।

যেমন গৃহস্থবৌ সব সময়ে সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকে তবে সন্তান হবার সময়ে সব কাজ ছেড়ে দেয়। প্রসব হলে আর তার অন্য কাজ করতে ভাল লাগে না তখন সে কেবল আপনার ছেলেটিকে লালন পালন করে আর তার মুখ চুম্বন করে আনন্দ পায়। মানুষও তেমন অজ্ঞান অবস্থায় নানা কাজ করে বটে

তবে ঈশ্বর-দর্শন পেলে আর তার সে কাজ ভাল লাগে না। তখন সে তাঁর কাজ ছাড়া আর অন্য কাজে আনন্দ পায় না, আর তাঁকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না ॥

বিরাট ঈশ্বর…তুচ্ছ উপহারও গ্রহণ করেন

৬৩

প্রজা যদি সামান্য উপহারও জমিদারকে উপহার দেয়—তবে যত বড় জমিদার হোক না কেন তিনি আদর করে সেই উপহার নেন। সেই রকম…ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর বিরাট হলেও তিনি মানুষের সামান্য তুচ্ছ উপহারও আদরে গ্রহণ করেন ॥

তবে লোকটি সেই একই

৬৪

যারা ধর্ম কর্ম করছে তাদের মধ্যেও দেখি যে, এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে—মানে পরস্পরের ধর্ম নিয়ে, যেমন হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ঝগড়া করছে নিজেদের

মধ্যে। কিন্তু তাদের গোড়ামীর জন্যে তারা একথা বোঝে না যে যিনি কৃষ্ণ তিনিই শিব, তিনিই আদ্যাশক্তি, তিনি যিশু আবার তিনিই পরম ব্রহ্ম এবং তিনি আল্লা। যেমন ধর রামনামের একটি লোক—কারো বাবা, কারো খুড়ো, কারো পিশে, কারো মামা, আরও কত কি! তবে সেই লোকটি সেই একই ॥

কেউ পর নয়!

৬৫

সকলকেই আপনার করে নাও কেউ তোমার পর নয়। তাই সকলকেই ভালবাসতে হয়। কেন না, সর্বভূতে সেই হরিই বিরাজ করছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নেই। যখন প্রহ্লাদকে ভগবান বললেন—"তুমি বর নাও—।"

প্রহ্লাদ বললেন—"ঠাকুর আমি তোমার দর্শন পেয়েছি আর আমার বর কি হবে, আমার কিছুই চাই না।"

ঠাকুর বললেন—"না তা হয় না, তুমি বর নাও।"

 ঠাকুর যখন ছাড়লেন না তখন প্রহ্লাদ

বললেন—"তবে তুমি বরই যদি দাও এই বর দাও যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে তাদের যেন কষ্ট না হয়... !"
সেই এক জ্ঞান, এই ঠিক জ্ঞান..."ব্রহ্মময় জগৎ... ।" তিনিই সব হয়েছেন । ভাল মন্দ !

জগৎ-ব্রহ্ম

৬৬

শঙ্করাচার্য্য পরম ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তবে প্রথম প্রথম ভেদবুদ্ধিও ছিল—তেমন বিশ্বাস ছিল না । একদিন শঙ্করাচার্য্য গঙ্গায় চান করে ওপরে উঠে আসছিলেন এমন সময়ে এক চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে আসছিল, তারপর চলত চলতে দুজনের পায়ে পায়ে ঠেকে যায়, তখন শঙ্কর বললেন—"তুই আমায় ছুঁলি ?"
শঙ্করের কথায় চণ্ডাল বললে—"ঠাকুর ! তুমি ত আমায় ছোঁওনি আমিও তোমায় ছুঁইনি... ।"
এর মানে যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি ভেতরে আছেন...তিনি শরীর নন, পঞ্চভূত নন, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব নন, তিনিই 'জগৎ-ব্রহ্ম' অর্থাৎ সর্বভূতে যিনি আছেন সেই হরি ॥

ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা মুখে বলা যায় না

৬৭

যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে ত শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম বললে কি হবে ওতে ফাঁকা আওয়াজ ওতে কি হয় ? আর ব্রহ্ম যে কি বস্তু তাও মুখে বলা যায় না।

এক বাপের দুই ছেলে—তিনি ছেলে দুটিকে ব্রহ্মবিদ্যা শেখাবার জন্যে আচার্য্যের হাতে দিলেন। বেশ কয়েক বছর পরে তারা আবার গুরুগৃহ থেকে ঘরে ফিরে এল, এসে বাপকে প্রণাম করলে। তখন বাপের ইচ্ছা হল যে ছেলেদের কেমন শিক্ষা হয়েছে তা যাচাই করে দেখতে। তিনি বড় ছেলেকে বললেন—'বাপু তুমি ত সব পড়েছ ব্রহ্ম কি রূপ বলত— ?" বড় ছেলে বেদ থেকে আউড়ে নানা শ্লোক পড়ে ব্রহ্মের স্বরূপ বলতে লাগল। বাপ তা শুনে চুপ করে রইলেন। তারপর ছোট ছেলেকে তিনি একই প্রশ্ন করলেন। ছোটছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় সে মুখ হেঁট করে রইল। মুখে কোন কথাই কইলে না। বাপ তখন বুঝলেন যে ছোট ছেলেরই কিছু হয়েছে তখন বাপ খুশী হয়ে ছোট

ছেলেকে বললেন— বাপু ! তুমি একটু বুঝেছ । সত্যিই ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা মুখে বলা যায় না ॥

ত্যাগই সাধুর আদর্শ

৬৮

এক যাত্রায় একজন গেরুয়া পরে শিব সেজে-ছিল । তার পার্ট খুব ভাল হয়েছিল, যাত্রা যখন ভেঙে গেল তখন যে শিব সেজেছিল, লোকে তাকে টাকা দিতে এল, সে তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে গেরুয়া ছেড়ে রেখে এসে তবেই টাকা নিলে । কেননা ভেকের (বেশ পোষাক) মর্যাদা দিতে হয় । ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয় তাই ভেকের আদর করতে হয় ।
চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন ।
যে মূঢ় বাসনা থাকতে গৈরিক ভেক ধারণ করে তার ইহকালও নেই পরকালও নেই, দুই যায় । সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবেই লোকে ত্যাগ করতে শেখে কেননা ত্যাগই সাধুর আদর্শ তাই সাধু সন্ন্যাসীরাই জগত-গুরু ॥

গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করা চাই

৬৯

গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য্য বা গুরু হওয়া উচিৎ নয়। গুরু করার আগে শিষ্যের যদি গুরুর প্রতি কোন সন্দেহ থাকে তবে আগে তা ভঞ্জন করে নেওয়া উচিত। তারপর গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে গুরুকে অবিশ্বাস করলে বা ত্যাগ করে অন্য গুরু করলে মহাপাপ হয়।

যিনি মনের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন—তিনিই গুরু। গুরু যা বলে দেবেন যুক্তি তর্কে না গিয়ে পরম সত্য বলে মেনে নেবে। গুরুকরণ না হলে দেহমন শুদ্ধ হয় না কাজেই ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব হয় না।

গুরুতে ঈশ্বর জ্ঞান থাকলে সহজে ইষ্ট দর্শন হয়। শিষ্যের প্রথমে গুরু দর্শন হয় পরে ইষ্ট দর্শন হয়। শিষ্য তখন ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে—'গুরুদেব, আমার ধ্যানের ইষ্ট মূর্ত্তি কই?'

গুরু বলেন—'ঐ· ·ঐ··· ।'

 শিষ্য তখন ইষ্ট মূর্ত্তি দেখতে পায় এবং গুরু

ক্রমশঃ ইষ্টরূপে মিলিয়ে যান। তখন গুরুও ইষ্টে একাকার দেখে শিষ্য পরমানন্দ লাভ করে॥

ধর্ম কথা মুখে বলা সহজ কাজে করা কঠিন

৭০

সংসারে লাভের আশায় মানুষ অনেক ধর্ম কর্ম করে কিন্তু পরে সব ভুলে যায়। নৌকায় বসে মানুষ যখন দেখে যে ভয়ঙ্কর স্রোত আসছে তখন সে আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে—"রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলে। যখন সেই ভয়ঙ্কর জল এসে তার পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল তখন সেও "যাঃ শালা" বলে নিশ্চিন্দি হয়। বদ্ধজীবের দশাই ঐ,যখন বিপদে পড়ে তখন কাতর প্রাণে ভগবানকে ডাকে কিন্তু যেই বিপদ চলে গেল তখন সব ভুলে গেল। যেমন শাস্ত্র পড়ে লোককে ঈশ্বর বোঝানো আর ছবিতে কাশী দেখিয়ে লোককে কাশী বোঝানো একই কথা। 'নাক তেরে কেটে তাক' বোল মুখে বলা সহজ কিন্তু কাজে করা বড়ই কঠিন।

তেমনই ধর্মকর্মের কথা মুখে বলা সহজ কিন্তু কাজে করা আর হয় না ॥

ধর্ম আলোচনা করলেও মনে কুভাব ওঠে কেন— ?

৭১

…একজন লোক রাতদিন একটা কুকুব নিয়ে বসে থাকত। কখনও তাকে কোলে বাখত আবার কখনও তার মুখে মুখ দিযে বসে থাকত। একজন বিজ্ঞ লোক এসে তাব কাণ্ড দেখে তাকে ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে কুকুর পশুর জাত তাকে অত আদর দিতে নেই কোনদিন আদর করতে করতে কখন টপ কোবে কামড়ে দেবে তা ঠিক নেই। লোকটি বিজ্ঞ লোকের কথার যথার্থতা বুঝতে পেরে কুকুরটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে এবং আর কখনও তাকে কোলে নেবে না ঠিক করলে। কুকুরটা অতশত বোঝে না সে লোকটাকে দেখলেই তার কোলে উঠতে চায়। দিনকতক কুকুরটা কোলে উঠতে চাইলেই লোকটি তাকে মারত তারপর আর কুকুরটা কোলে উঠতে চাইত না। দেখ, তোমাদেরও

সেই দশা এত কাল যাকে কোলে করে এসেছ আজ তাকে তুমি ছাড়লেও সে তোমাকে ছাড়বে কেন ? তবে ওতে দোষ নেই । কুকুর তোমার কোলে উঠতে আসুক তবে তুমি তাকে আর কোল নিও না বরং প্রহার দিও দেখবে যে সে দিনকতক বাদে পালিয়ে গেছে ।

মনে কুভাব ওঠে, তা উঠুক ওতে কোন দোষ হবে না । মনের পাপ, পাপ নয় । কুকাজ না করলেই হল ।

বিশ্বাসী ভক্তের মনেও কখন হতাশা, নিরাশা আসে, তবে চলে যায়—।

৭২

স্রোতের জল বেগে যেতে যেতে এক এক জায়গায় ঘুরতে থাকে । কিন্তু তখুনি আবার সোজা হয়ে বেগে চলে যায় । বিশ্বাসী ভক্ত হৃদয়ে কখন কখন অবিশ্বাস, নিরাশা, দুঃখ প্রভৃতি এসে পড়ে কিন্তু তা বেশীক্ষণ থাকতে পারে না । শীগ্গির চলে যায় । কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের মন সামান্য কারণে টলে যায় ।

জীব তিন রকম— ।

৭৩

জীব তিন প্রকার—নুনের পুতুল, কাপড়েব পুতুল ও পাথরের পুতুলকে সমুদ্রেব জলে ফেলে দিলে—নুনের পুতুল সমুদ্রেব জল একেবাবে গলে যায় । কাপড়ের পুতুলে জল ঢোকে বটে তবে সে জলের সঙ্গে মেশে না, তাকে যদি ইচ্ছে করা যায় জল থেকে আলাদা করা যায় । কাপড়ের পুতুল ইচ্ছে করলে ডুবতেও পারে ভাসতেও পারে । আর পাথরেব পুতুল বদ্ধজীব তার ভেতব কোনমতে জল ঢোকে না—তার ভেতর—তেমনই কোনমতে ঐশ্বরিক কথাও ঢোকে না । তাবা বিষয় ছাড়া কিছুই বোঝে না । নুনের পুতুল মুক্ত জীব, কাপড়ের পুতুল সংসারী জীব ও পাথরের পুতুল বদ্ধ জীব ।

বিষয়ীরা কেমন ?

৭৪

সংসারে দুরকম স্বভাবের লোকেরা বাস করে । এক রকম লোকেরা সার জিনিষ চায় আর অন্যরা অসার জিনিষ সংগ্রহ করে । কতক

কুলোর মত স্বভাব আর কতক চালুনীর মত ভাব। কুলো যেমন অসার জিনিস ফেলে দেয় সার জিনিষ আপনার ভেতরে রাখে আর চালুনি তেমন সার বস্তু সব ফেলে দিয়ে অসার জিনিষ আপনাব ভেতরে রাখে, সংসারেও তেমন একদল ঈশ্বরকে চায় আর অন্যেরা সার বস্তু ঈশ্ববকে বাদ দিয়ে অসার কাম-কাঞ্চনকেই [কাম, অর্থে কামনা বাসনার উৎস] কেবল গ্রহণ করে।

বিষযীদের ভাব এই রকম তাবা যখন সাধুর কাছে আসে তখন বিষয়ের চিন্তা সব যেন একেবারে লুকিয়ে ফেলে। সাধুর কাছ থেকে চলে গিয়ে আবার সে সব ঠিক ঠিক বার করে যেমন পায়রারা মটর খেলে মনে হল যেন সব হজম করে ফেললে কিন্তু তারপর তার গলায় হাত দিয়ে দেখ সব গজ্ গজ্ করছে।

বিষয়ীরাও তেমন।

একজন চাষা সমস্তদিন আখের ক্ষেতে জল দিয়ে শেষে দেখল যে দূরের একটা গর্ত্ত দিয়ে সমস্ত জল বেরিয়ে গেছে এক ফোঁটা জল ক্ষেতে যায়নি। সেই রকম বিষয় কামনা, মান সম্মান ও সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে মন রেখে যারা

ভগবানকে ডাকছে সারাজীবন তা করেও শেষে তারা দেখতে পাবে বাসনা কামনার ছেঁদা দিয়ে সবই তাদের বেরিয়ে গেছে, তাবা যেমন মানুষ তেমনই আছে, একটুও উন্নতি করতে পারেনি। বিষয়ীদের দশাই এই।

এক কানা তপস্যা করে ভগবতীকে তুষ্ট করে। ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বললেন—"বর নাও।"

তখন সে বল্লে—'মা যদি বর দেবে তবে এই বর দাও যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে, দেখে ভাত খাই।"

তার মানে একই সঙ্গে—স্ত্রী, পুত্র, নাতি, ধনদৌলৎ, চোখ সবই হল।একেই বলে পাটোয়ারী বুদ্ধি ৷৷ [অর্থাৎ বিষয়ী বুদ্ধি]

ভান ভাল নয়

৭৫

পাওনাদারকে ফাঁকি দেবার জন্যে এক জমিদার পাগল সেজেছিল পরে কিন্তু ডাক্তার কবরেজরাও তাকে আর ভাল করতে পারছিল না। তারপর একদিন এক প্রবীণ ডাক্তার তাকে দেখেই বললেন—'মশাই করেছেন কি ? ভান

করতে করতে যে আসল হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই ত দেখছি যে অনেকটা ছিট্ ছিট্ ভাব এসেছে।"

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে জমিদারের জ্ঞান হল তখন সে পাগলামী করা ছেড়ে দিলে। সব সময়ে কোন ভান করলে মনেও সেই রকম ভাব হতে থাকে।

অনেক লোক আছে, যারা বিনয় করে বলে 'আমি কীট, আমি কীট'। ঐসব লোকেরা কীট, কীট বলতে বলতে তারা নিজেরা সত্যিই একেবারে কীট হয়ে যায়। ভান করা ভাল নয়॥

অহঙ্কারই ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়…

৭৬

যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান…অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নেই;এতে রাজোগুণ বৃদ্ধি হয়, ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয় তাই সন্ন্যাসীরা নিরহঙ্কার। নীচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে—কিন্তু সে খুব ওপরে উড়তে পারে।

রজোগুণ থাকলেই তমগুণ আসবে—তাই টাকা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল—ব্যাঙটা যে গর্ত্তে থাকত টাকাটাও সেই গর্ত্তে থাকত। একদিন একটি হাতী চলতে চলতে ব্যাঙের গর্ত্তটা ডিঙিয়ে গেল,তাই দেখে ব্যাঙটার ভারী রাগ হল সে তাড়াতাড়ি গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে হাতীর উদ্দেশ্যে লাথি মারতে লাগল—আর টাকার গরমে বলতে লাগল—"এত বড় আস্পদ্দা যে আমায় ডিঙিয়ে যায়।"

টাকা হলে এই রকমই হয়। [ব্যাঙও হাতীকে লাথি মারতে চায়।]

মায়া রূপ কাদা ধুয়ে গেলে ঈশ্বর টানেন

৭৭

ভগবানের সঙ্গে জীবের খুব নিকট সম্পর্ক তবে জীবের প্রতি ঈশ্বরের আকর্ষণ হয় না কেন ?

যেমন লোহাতে কাদা মাথা থাকলে চুম্বক টানে না। সেই রকম জীবেতে মায়া রূপ কাদা

মাখান থাকলে ঈশ্বর টানেন না। লোহার কাদা ধুয়ে গেলে চুম্বক টানে, সেই রকম তাঁর কাছে কাঁদলে যখন জীবের মায়া-কাদা ধুয়ে যায় তখনই ভগবান টানেন ॥

সংসার যেন চিলের মুখে মাছের মত

৭৮

একটা চিল মাছ মুখে করে উড়ে যাচ্ছে আর তার পেছনে শয়ে শয়ে কাক ছুটছে। সেই কাকগুলো ঠুকরে, কামড়ে বিরক্ত করে নানাভাবে মাছটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। চিলটা যেদিকে যায় সমস্ত কাকগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছনে যায়। শেষে বিরক্ত হয়ে চিলটা মাছটা ফেলে দিলে আর তৎক্ষণাৎ অন্য আর একটা চিল উড়ে এসে মাছটা মুখে করে তুলে নিলে তখন সমস্ত কাকগুলো সেই চিলটার পেছনে চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে লাগল। এইবার প্রথম চিলটা নিশ্চিন্দি হয়ে শান্তভাবে একটা গাছে বসে রইল। তাই দেখে অবধূত প্রণাম করে বললেন—"বুঝলুম সংসারের ভার ফেলে দিতে পারলেই শান্তি তা না হলে মহাবিপদ" ॥

সঞ্চয়ের পরিণাম— !

মৌমাছি কত কষ্টে মধু সঞ্চয় করে তারপর হঠাৎ কোথা থেকে মানুষ সেই চাক ভেঙে তার মধু নিয়ে গেল, তার সঞ্চয়ের ধন সে উপভোগ করতেই পারলে না। তাই দেখে অবধূত মৌমাছিকে নমস্কার করে বললেন—"তুমি আমার গুরু। সঞ্চয় করলে পরিণামে যে কি হয় আমি তা তোমার কাছ থেকে শিখলুম·· ।"

ভগবান দুবার হাসেন—

৭৯

ভগবান দুবারহাসেন। ভায়ে ভায়ে যখন দড়ি ফেলে জমি ভাগ করে বলে—'এ জমি আমার ও জমি আমার আর রুগী যখন মরে ডাক্তার বলে—'আমি বাঁচাব', তখনই তিনি হাসেন ॥

ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদে কেন— ?

৮০

গর্ভে ছিলাম—যোগে ছিলাম, ভূমিষ্ঠ হয়ে কোথায় এলাম এই বলে কাঁদে। "—কাঁহা এ কাঁহা এ" এ কোথায় এলাম। ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করছিলাম, এ আবার কোথায় এলাম—

অন্ধকারের ধর্মই ধর্ম… ।

৮১

লোকচক্ষুর আড়ালে হলেও—যিনি ভাবেন যে ভগবান সবকিছুই দেখতে পান, এই কথা ভেবে যিনি অধর্মাচরণ করেন না তিনিই যথার্থ ধার্মিক । মাঝ রাতে, জনশূন্য মাঠে যিনি সুন্দরী যুবতীকে দেখেও কুদৃষ্টি করেন না তিনি ঠিক ধার্মিক ! আর যিনি কেবল বাইরে আলোয় [প্রকাশ্যে] ধর্মানুষ্ঠান করেন [আড়ালে বা অন্ধকারে তা করেন না] তিনি যথার্থ ধার্মিক নন । আলোর ধর্ম ঠিক নয়, অন্ধকারের ধর্মই ধর্ম ।

[অর্থাৎ মধ্য রাত্রে, নির্জন প্রান্তরে, মনের গহন গভীরে…'সদা সর্বত্রে ভগবানের অগোচর কিছুই নেই, তিনি সব কিছুই দেখছেন' এই কথা ভেবে যিনি কোন অসৎ কাজ, বা অসৎ চিন্তাও করেন না তিনিই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ॥]

সাধু সঙ্গ নেশা কাটায়… !

৮২

সাধুসঙ্গ চালের জলের মত [চাল ধোওয়া জলের মত], চালের জলে নেশা কাটায় । যার

খুব নেশা হয়েছে তাকে চালের জল খাওয়ালে দেখবে তার নেশা চলে যাবে। সংসার মদে মত্ত জীবের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ ॥

রাজার সঙ্গে যার বন্ধুত্ব সে কি মুটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সুখ পায় ?

৮৩

যে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, সামান্য মুটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সে কি সেই সুখ পায়— ? অর্থাৎ যে ভগবান পেয়েছে তার মন সামান্য জিনিষে যায় না। যে মিছরীর সরবৎ খায় সে কি চিটে গুড়ের পানা খেতে চায় ?

ঠিক ঠিক সাধু ও ত্যাগী কিছুই চায় না

৮৪

ঠিক সাধু ও ঠিক ত্যাগী তারা সোনার থালাও চায় না মানও চায় না। তাই ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না, তাঁকে পেতে হলে যা যা দরকার সবই যোগাড় করে দেন তিনিই।

সাধুকে চেনবার উপায় কি ?

৮৫

কামাবশালেব হাপরখানায় বসলে ঠাণ্ডা গাও গরম হয়ে ওঠে, তেমনই যাব কাছে থাকলে মনে ধর্মবোধেব উদয় হয়—বুঝবে তিনিই সাধু ॥

জ্ঞানী সাধক ও প্রেমী সাধক

৮৬

বনের মধ্যে দিয়ে দুটি সাধক যাচ্ছিলেন—চলতে চলতে তাঁরা পথের মধ্যে একটি বাঘকে দেখতে পেলেন । জ্ঞানী সাধকটি বললেন—'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন, আমাদের আর পালাবার কোন কারণ নাই ।' প্রেমিক সাধকটি বললেন—"না ভাই, আমাদের দিয়ে যে কাজটি হবে তার জন্যে কেন আর আমরা ভগবানকে মিছামিছি পরিশ্রম করতে দেবো । এস আমরা পালিয়ে যাই··· ।" দেখ, তাহলে জ্ঞানের চেয়ে প্রেমই বড়··· ।

মানুষ যত পাপই না করুক কেন,
উদ্ধারের ব্যবস্থা ভগবানই করে দেন।

৮৭

ছেলের স্বভাব কাদা ঘাঁটা। মা কিন্তু তা করতে দেন না;তিনিই মাঝে মাঝে গা মুছিয়ে পরিষ্কার করে দেন। মানুষ যত পাপই করুক না কেন ; ভগবান তার উদ্ধার করে দেনইদেন ॥

তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকলে…পাপ তাপ আপনি শুকিয়ে যায়।

৮৮

পাপী মানুষ ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে পড়ে থাকলে তাঁর দয়ার গুণে আপনা-আপনি পবিত্র হয়ে যায়। যেমন মাঠের জল কেউ ব্যবহার না করলেও রোদে তা আপনি শুকিয়ে যায় ॥

ঠিক বিশ্বাসী তাঁকে না পেলেও ছাড়ে না।

৮৯

যেমন খানদানী চাষা বার বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ করতে ছাড়ে না তেমনই ঠিক বিশ্বাসী [ভক্ত] সারা জীবনে তাঁর দর্শন না পেলে তাঁকে ছাড়ে না ॥

বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে তিনি শীঘ্র উদয় হন।

৯০

মাছ যত দূরেই থাক না কেন ভাল ভাল চার ফেলবা মাত্র তারা ছুটে আসে । ভগবানও সেই রকম, বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে তিনি শীঘ্রই উদয় হন ॥

তাঁকে জোরে ডাকা কি আবশ্যক ?

৯১

তিনি পিঁপড়ের পায়ের শব্দও শুনতে পান । তোমাদের যে রকম ইচ্ছে ডেকো, তিনি সবই শুনতে পারেন ॥

তার অনন্ত নাম, অনন্ত ভাব

৯২

যার যে নামে, যে ভাবে ভগবানকে ডাকতে ভাল লাগে সেই নামে সেই ভাবে ডাকলে তার তাঁকেই লাভ হবে । তিনি অনন্ত নামে ও ভাবে ॥

তাঁকে চিন্তা করতে করতে দেবভাব আসবে— !

৯৩

তাঁকে যতই চিন্তা করবে, সংসারেব সামান্য জিনিষের প্রতি আসক্তি ততই কমে যাবে । তাঁর পাদপদ্মে যতই ভক্তি হবে বিষয়-বাসনা ততই কমে যাবে, দেহের সুখের দিকে নজব কমবে । নিজেব স্ত্রীকে সহায়বন্ধু বলে মনে হবে, দেবভাব আসবে । সংসাবেব আসক্তি থাকবে না,তখন সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতে পাববে ॥

মন মুখ এক করাই হচ্ছে তপস্যা ।

৯৪

কলিতে— মন মুখ এক করাই হচ্ছে তপস্যা । মুখে বলছি হে গোবিন্দ তুমিই আমার সব কিন্তু মনে বিষয়কেই সব ভাবছি, না, এরকম করলে চলবে না । মন মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধনা ॥ [অর্থাৎ ছলনারাহিত্য । মনে এবং মুখে একভাব, ভিতরে বাহিরেও সেই একইভাব এবং সেই রকম ভাবে মন মুখ এক করেই তাঁকে স্মরণ মনন করাই হচ্ছে তপস্যা ॥]

মন যদি ঈশ্বরে থাকে তবেই নির্ভয়।

৯৫

জাহাজের কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে, তাই জাহাজের ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা হলে কোন ভয় থাকে না ॥

কলিতে নাম সার।

৯৬

কলিকালে একমাত্র হরিনামই সার, কারণ জীবের পরমায়ু অতি অল্প, তাতে আবার রোগে ভোগে জরাজীর্ণ। তারা আবার কঠোর তপস্যা করবে কেমন করে। যারা সন্ন্যাসী হয়েছে তারা সংসারের সব বন্ধন থেকে আপনি মুক্ত হয়েছে, তারা যদি বনে গিয়ে ভগবানের ধ্যানজপে মগ্ন হয় সে আর বেশী কথা কি ? কিন্তু যারা সংসারে থেকে স্ত্রী-পুত্র, বাপ-মা, সকলের ভরণপোষণের জন্যে সমূহ কাজ করতে করতে মনে মনে যদি ঈশ্বরকে স্মরণ মনন করতে পারে ত তাদের ঈশ্বরের বেশী কৃপা প্রকাশ পায়। যে জীব সংসারে থেকে মনে মনে তাঁকে একবার

স্মরণ করতে পারে ভগবান তাকে সুব বা বীরভক্ত বলেন ॥

আত্মসমর্পণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাধনা ।

৯৭

আত্ম-সমর্পণের চেয়ে সহজ সাধনা আর নেই । আত্মসমর্পণে—আমার বলে কিছু থাকবে না তখন না হয়, তুঁহুঁ, তুঁহুঁ । তাই আমার বলে কোন অহঙ্কারও আর থাকে না, আত্মসমর্পণ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাধনা ॥

মরবার সময়ে ঈশ্বর চিন্তাই দরকার ।

৯৮

গীতায় আছে মরবার সময়ে মনে যে ভাবের উদয় হয় পরজন্মে সেই ভাবের আকারে জন্ম হয় । তাই সাধনার দরকার,ক্রমাগত অভ্যাস করলে মরবার সময়ে ঈশ্বরকেই স্মরণ হয়, আর অন্য কোন ভাব ওঠে না, সর্বদা স্মরণ মনন দরকার । ভরতরাজা মৃত্যুকালে হরিণকে ভাবতে ভাবতে [পরজন্মে] হরিণ জন্ম হয়েছিল । তাই অভ্যাস যোগের দরকার ॥

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হলে আর কোন ভয় থাকে না— !

৯৯

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হলে আর রিপুদের ভয় থাকে না। বাঘ যেমন কপ্ কপ্ করে জানোয়ার ধরে খেয়ে ফেলে তেমনি অনুরাগ বাঘও কাম, ক্রোধ, লোভ এইসব রিপুদের খেয়ে ফেলে আর ভয় থাকে না। ব্রজগোপীদেরও ঐ অবস্থা হয়েছিল ॥

জীব যখন বলে তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র তখনই তার মুক্তি··· !

১০০

জীব যদি বলে, হে ঈশ্বর আমি কর্ত্তা নই তুমি কর্ত্তা, তুমিই সব। যেমন চালাও তেমন চলি, তখনই জীবের সংসার ভোগ-যন্ত্রণার শেষ হয়। তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র বাজাও আমারে···" একথা যখন সে বলতে পারে— তখন আর তাকে আসতে হয় না !

সর্বদা স্মরণ মনন কর আর কিছুই করতে হবে না— ।

১০১

তোমবা সবল হও আব উদাব হও । ব্যাকুল হযে ডাকো, একবাব নির্জনে গিযে কাঁদো দেখা দাও বলে, তিনি দেখা না দিযে পাববেন না । সর্বদা স্মবণ মনন কব , স্মবণ মনন কব—আব কিছুই কবতে হবে না বাকীটা তিনিই কবিযে নেবেন ॥

কোন্নগব থেকে এক ব্রাহ্মণ আসত—সে আমাব সঙ্গে খুব বিনয কবে কথা বলত । দক্ষিণেশ্ববে প্রায সে আসত । এখানকাব কথাবার্ত্তা বসে বসে সে শুনত । তাবপব সে অনেকদিন না আসাতে আমি একদিন হৃদুকে সঙ্গে নিযে কোন্নগবে তাব সঙ্গে দেখা কবতে গেলুম । গিয়ে দেখি সে গঙ্গাব ধাবে বসে হাওযা খাচ্ছে । আমাকে দেখে সে চেঁচিযে বলে উঠল—"কি ঠাকুর কেমন আছ ?" তার কথা বলার ধবন দেখে আমি ত অবাক হযে গেলুম, বুঝলুম যে বামুনের টাকা হযেছে । তাই হৃদুকে বল্লুম—"ওরে হৃদু, এই লোকটাব টাকা হয়েছে বুঝতে পাচ্ছি… ।"

 আমাব কথা শুনে হৃদু হাসতে লাগল ॥

টাকায় কি হয়— ?

১০২

কাম-কাঞ্চন অনিত্য,ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয় ? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা ইত্যাদি হয়, কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা কখনই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না ৷৷

মায়া—কি— ?

১০৩

মায়া না মেয়ে ; জগৎ দিলে খেয়ে ! মায়া কাকে বলে জানো— ? বাপ, মা, ভাইবোন, স্ত্রী-পুত্র, ভাইপো, ভাগনে, ভাইঝি এইসব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসাকে মায়া বলে। [অর্থাৎ আমি আমার সম্পর্কিত সম্বন্ধের প্রতি কেবল ভালবাসা] আর দয়া মানে সর্বভূতে, সকলের প্রতি যে ভালবাসা, তাকেই দয়া বলে ৷৷

মায়াকে চিনতে পারলে সে পালায়— !

১০৪

এক গুরু শিষ্য-বাড়ী যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোন চাকর ছিল না তাই পথ চলতে চলতে একজন মুচীকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, 'ওরে, আমার সঙ্গে যাবি ? চল না, ভাল খাবি আদরে থাকবি—চল ।"

মুচী বললেন—"ঠাকুব,আমি অতি নীচ জাতি আমি কি করে আপনার সঙ্গে যাবো— ?"

তখন গুরু বললেন—"তাতে তোর কোন চিন্তা নেই, তুই কারুর সঙ্গে আলাপ করিসনি, আর কাকেও আপনার পরিচয় দিসনি ।"

মুচী রাজী হয়ে গুরুর সঙ্গে গেল । শিষ্য-বাড়ী গিয়ে শিষ্য যখন সন্ধ্যাহ্নিক করছেন তখন আর একজন ব্রাহ্মণ এসে সেই চাকরকে বললেন—ওরে, অমুক জায়গা থেকে আমার জুতো জোড়াটা এনে দেত ।"

চাকর কথা কইলে না । ব্রাহ্মণ আবার বললেন, সে তাতেও চুপ করে রইল । ব্রাহ্মণ দু-চারবার বললেন তাতেও সে নড়ল না ।

শেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে বললেন—"আরে তুই বেটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিসনে তুই জাত মুচী

নাকি— ?
মুচী একথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গুরুর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললে—ঠাকুর মশাই গো,— আমায় চিনে ফেলেছে,আমি পালাই।
এই কথা বলে সে তৎক্ষণাৎ পালাল। ঠিক তাই, মায়াকে একবার চিনতে পারলে সে পালায়॥

ডুবে যাও… !

১০৫

তোমরা সচ্চিদানন্দ সাগরের কিনারে বসবে না ডুব দেবে— ? আমি বলি কি তোমরা ডুব দাও, ডুবে যাও…ডুব…ডুব…ডুব সাগরে ওরে আমার মন ! তোমরা একেবারে ডুবে যাও, তাঁতে ডাইলুটেড [Diluted] হয়ে যাও…।

সংসারীদের জন্য ঠাকুরের প্রার্থনা—

১০৬

"মা, তোমার কাছে আসছে যারা, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো মা। সংসারে যদি রাখিস ত এক এক বার দেখা দিস, তা না হলে কেমন করে থাকবে…উৎসাহ কেমন করে হবে মা… ?"
"মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ কোর না…"